ব্যাধির পরাজয়
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা-ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব, জ্ঞানের সেই পরিবেষনকার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাধির পরাজয়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
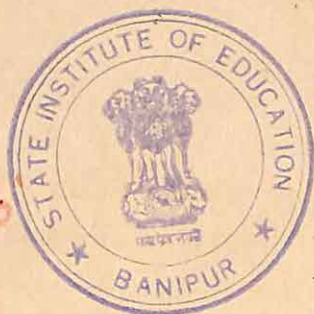
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৬ আষাঢ়

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

৩.১

অধ্যায়সূচী

চিত্রসূচী

ভূমিকা

মানুষ মাত্রেরই রোগ হয়, এর আর ব্যতিক্রম নেই। রোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা রোগীর জানতে ইচ্ছা হয়। এই পুস্তকের কথাগুলি এক আনাড়ী অন্য আনাড়ীদের বলছে। এক গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে ধ্যানধারণা এক রকমের হয় বলে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াটা সহজ হয়, তাই আমার এই প্রয়াস। শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীমান অমরেন্দ্রকুমার সেন, শ্রীমান অমলচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। বন্ধুর সাহায্যকে ঋণ বলে ধরলে সংসারে দেউলে হতে হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
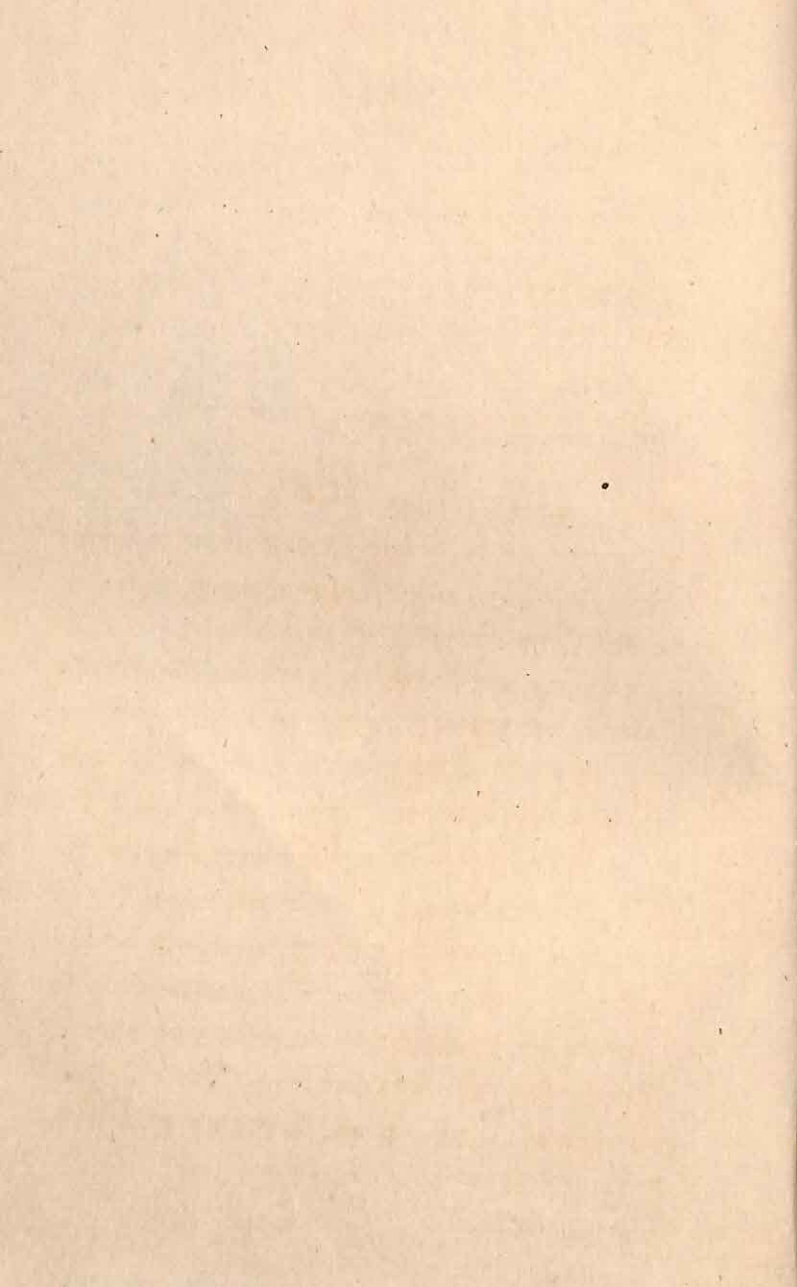
ব্যাধির জয়

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে, শিশুর হাতও পুড়বে, বৃদ্ধের হাতও পুড়বে। পর্বতের কিনারায় পৌঁছে এগিয়ে পা বাড়ালে পড়তে হবে, পাপীকেও পড়তে হবে, পুণ্যাত্মাকেও পড়তে হবে, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার দণ্ড পেতেই হবে। মানুষের তৈরি নিয়ম উপেক্ষা করে কখন-সখন পার পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতি একজন কঠোর বিচারক, সে কাউকে ছেড়ে কথা কয় না, কাউকে রেহাই দেয় না। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম সব জানতে থাকল, বিপদ থেকে সাবধান হয়ে চলল, আগুনে হাত দিল না, পর্বতের কিনারায় এসে আর এগিয়ে চলল না।

সুস্থ থাকতে হলে, নিরাময় থাকতে হলে মানুষকে কতকগুলি নিয়ম পালন করে চলতে হবে, অবহেলা করলে তার দাম দিতে হবে। নিয়ম জানি নে বললে চলবে না। মানুষের তৈরি আইন সম্বন্ধে যদিও সেই কথা আছে, তবু না জেনে অপরাধ করে ফেলেছে জানলে হাকিম একটু দয়াপরবশ হন। কিন্তু স্বাস্থ্যের নিয়ম ভাঙলে কোন ক্ষমা নেই। শুধু কি তাই, অনেক ব্যাপারে দু-তিন পুরুষ অবধি শাস্তি চলতে থাকে। এখানে আর-এক বিপদ এই, স্বাস্থ্যপালনের নিয়ম সব কি কি, কোন্ ত্রুটিতে কি শাস্তি পেতে হবে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বহুদিন মানুষ জানল না, শাস্তি পেল, কিন্তু কোন্ অপরাধের জন্য তা বুঝল না, সাবধান হতে পারল না। রোগ যখন এল, নিঃসহায় হয়ে ভুগতে থাকল,

মনে করল এ দেবতার ক্রোধ, দেবতাকে খুশি করবার উপায় ঠাওরাতে থাকল। আন্দাজে অনেক মুষ্টিযোগ, টোট্‌কা ব্যবহার করল, রোগ কখন সারল, কখন সারল না। রোগের ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে সময় সময় হয়ত ঠিক ওষুধটি পাওয়া গেল, কিন্তু রোগের উৎপত্তির কারণ জানা গেল না। চিকিৎসক রোগীর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে একটা প্রেসক্রিপসন লিখে চলে গেলেন, কিন্তু সে রোগ একজন থেকে আর-একজনে কি করে ছড়ায় সে সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছু জানেন না, সুতরাং কোন কথা জানিয়ে যেতে পারলেন না। শেষ অবধি ব্যাধিই জয়ী রইল। আর জয়ী বলে জয়ী! ইতিহাস থেকে দু'চারটে ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

খ্রীস্টপূর্ব ৮৮ সালে অক্টেভিঅসের সৈন্যদলের মধ্যে সতের হাজার লোক কোন এক সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। এক সময় অ্যাবিসিনিয়া-সৈন্যের ষাট হাজার লোক যে সংক্রামক রোগে মারা যায়, বিজ্ঞানী এখন সেটাকে বসন্ত বলে মনে করে। ১৬৩২ সালে একা টাইফস দুদিকের দুই সৈন্যদলকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে, নিজেদের মধ্যে তাদের যুদ্ধ করতে হয় নি। ইউরোপে নেপোলিঅনের ক্ষমতা খর্ব করে কে, যুদ্ধরত মানবশত্রু বা টাইফস প্রভৃতি ব্যাধি, তা জোর করে বলা চলে না। আর সেদিনের কথা, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ইংলণ্ডের দেড় লক্ষ লোক প্রাণ দিল, একা লণ্ডন শহরের হিসেব হল ষাট হাজার।

কিন্তু বিজ্ঞান এগিয়ে এল, রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ করল। আগের চিকিৎসকেরা রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে চলেছিলেন, এখনকার পদ্ধতি হল অন্য রকমের। কি কারণে
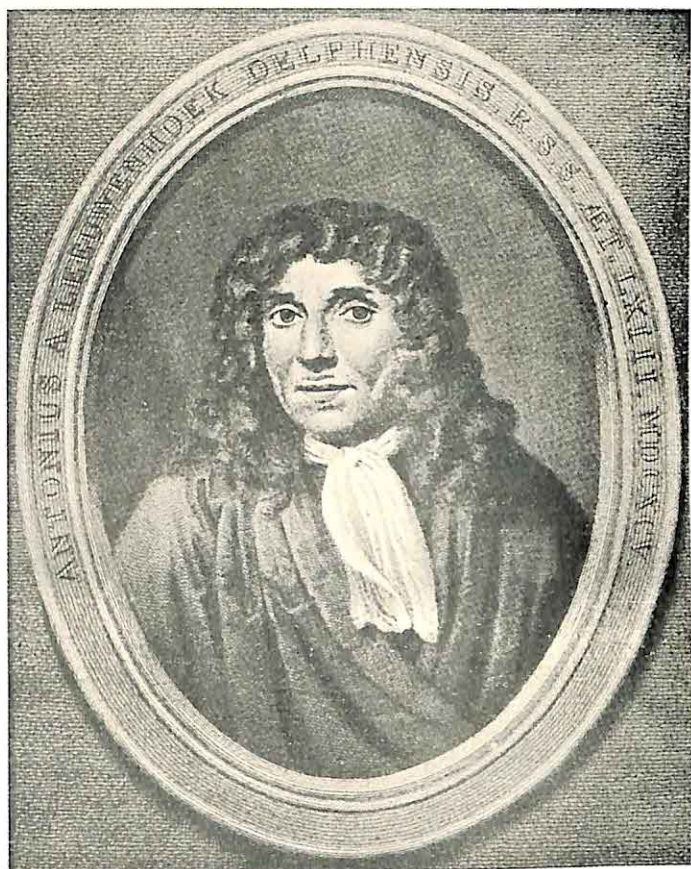
অ্যাণ্টনি ভ্যান লিউএনহুক

১৬৩২ - ১৭২৩

প্রথম অণুবীক্ষণযন্ত্রে প্রথম জীবাণু দেখেন

এডওআর্ড জেনার

১৭৪৯ - ১৮২৩

১৭৯৬ সালের ৪ মে আট বছরের একটি ছেলেকে প্রথম টিকা দিচ্ছেন
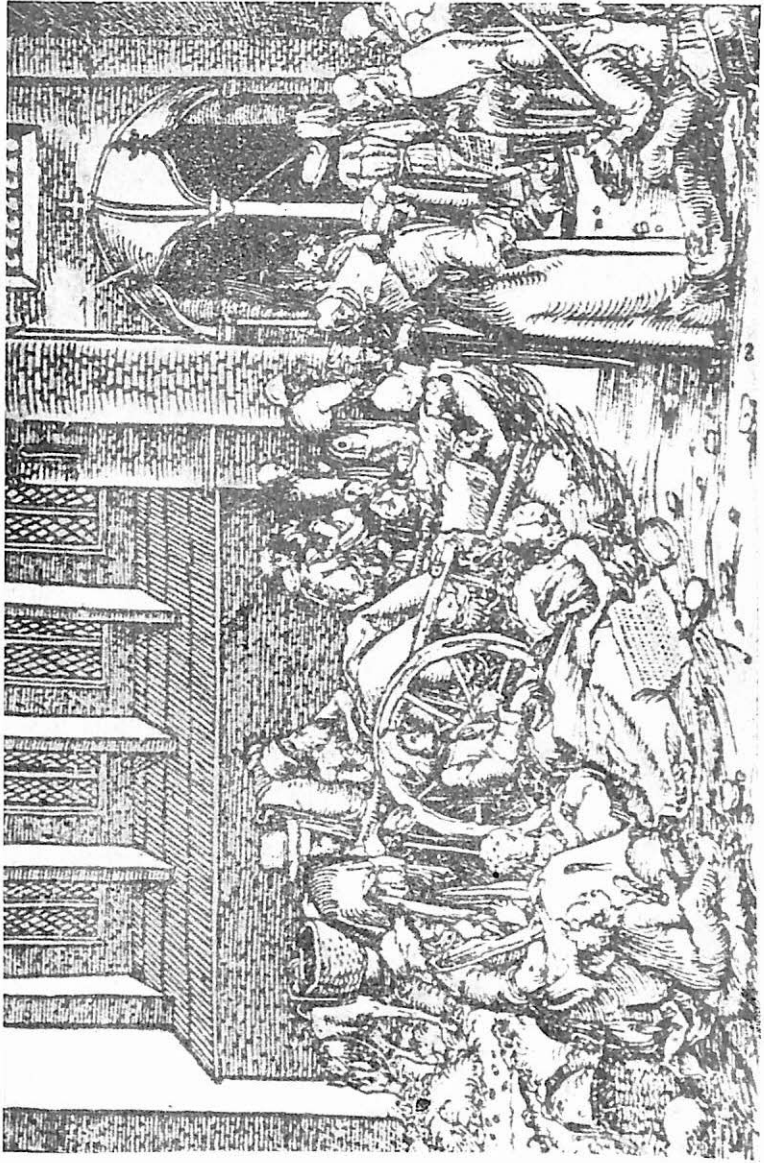
চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে ভীষণ প্লেগ-মহামারীর দৃশ্য ।   গির্জার সম্মুখে রোগীর ভিড়

পাস্তুর ইনস্টিটিউটের সম্মুখে বালক ও ক্ষেপা কুকুরের মর্মরমূর্তি
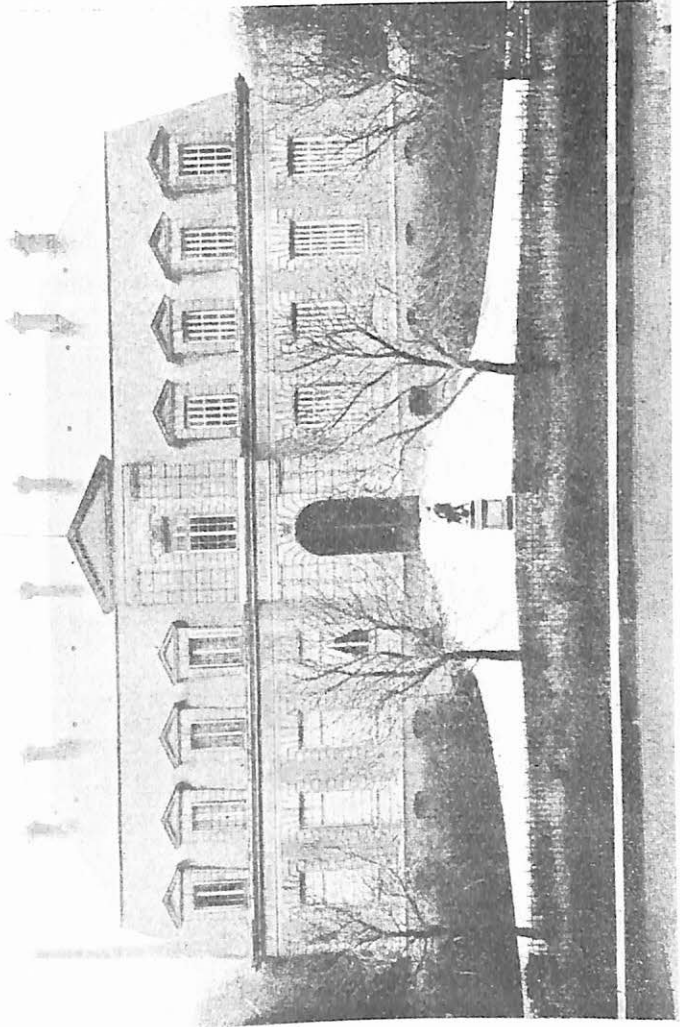
পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট, প্যারিস

প্যারিসের একোল নর্মাল্‌এ ছাত্রাবস্থায় পাস্তুর
শার্ল্‌ লেবাইল অঙ্কিত চিত্র হইতে

লুই পাস্তুর
১৮২২ - ১৮৯৫

রবার্ট কখ্
১৮৪৩ - ১৯১০
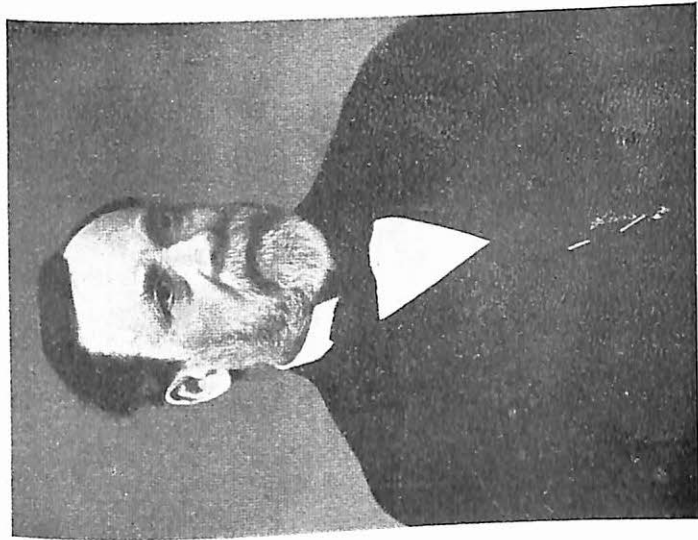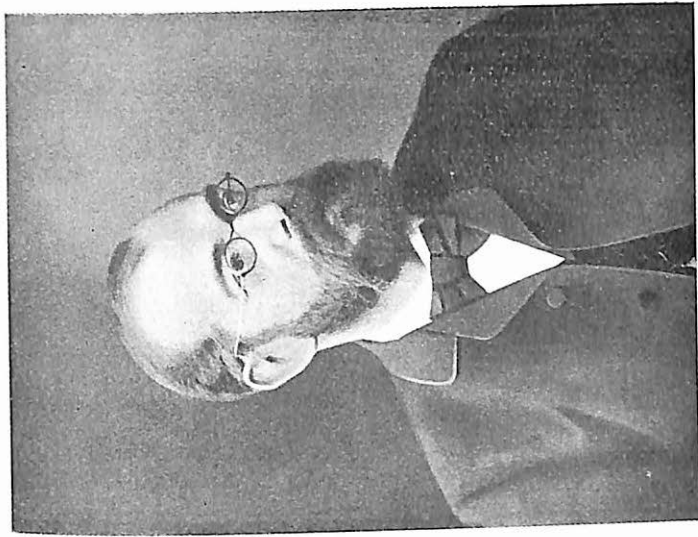
লর্ড লিস্টার
১৮২৭ - ১৯১২

সার্ রোনাল্ড রস্
১৮৫৭ - ১৯৩২

একটা রোগ হয়, কিভাবে সেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে, আর সেই রোগ একেবারে যাতে না আসে তার জন্য কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান অনুসন্ধান আরম্ভ করল।

জেনার ও বসন্তের টিকা

আগে বসন্ত রোগটা আকছার লোকের মধ্যে দেখা দিত। কেউ বাঁচত, অনেকে মরত। হওয়া না হওয়াটা মনে করত বিধির বিধান, হল তো হল, না হল তো না হল।

১৬৯৪ সালে ইংলণ্ডের রানী মেরি এই রোগে মারা যান। এ সম্বন্ধে মেকলে তাঁর ইংলণ্ডের ইতিহাস পুস্তকে লিখলেন—

আজ বিজ্ঞান ওই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছে। কিন্তু তখন সে অবস্থা ছিল না। প্লেগ অনেক লোককে নাশ করে চলে গেল বটে, কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় প্লেগ মাত্র একবার দুবার এসেছে। বসন্ত যেন বারোমেসে ব্যাপার ছিল। কবরস্থানে মড়ার পর মড়া আসছে। প্রত্যেক লোক ভয়ে অস্থির, কাকে কখন ওই রোগে ধরে। রোগের আক্রমণ থেকে যারা বেঁচে উঠল তাদের দেহ কি ভয়ংকর হল। মা তার কোলের শিশুর দিকে চেয়ে আতঙ্কিত হল, যুবক তার বাগ্‌দত্তার দিকে আর তাকাতে পারে না।

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়ের ইতিহাসটা হল এই রকম—

জেনার তখন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। ছাত্রাবস্থায়ও তিনি ভাবছেন কি করে বসন্তরোগের আক্রমণ থেকে মানুষকে

বাঁচান যায়। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে সকল গোয়ালিনী দুধ দোয় তাদের হাতে দুএকটি বসন্তের গুটি হয়, যাকে তারা গো-বসন্ত বলে। কিন্তু জেনার আরও লক্ষ্য করেন যে বসন্তের ওই গুটি হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, শরীরের আর কোনো জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে না, এমন কি বসন্তের মড়কের সময়েও না। তাছাড়া তখন এই কথা চলিত ছিল যে, একবার বসন্ত হলে আর দ্বিতীয়বার হয় না। কেন হয় না সে তারা জানে না, হয় না এই দেখে এসেছে। গোয়ালিনীর এই কথায় জেনার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটি আলোর রেখা দেখতে পেলেন।

জেনার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন, আর শেষ অবধি একটি গ্রাম্য প্রবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন। ষোল বছর ধরে নানারকম পরীক্ষা করে শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, গো-বসন্তের টিকা নিলে আর বসন্ত হবে না। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার পর ১৭৮৮ সালে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। প্রথম প্রথম সাধারণ লোক জেনারকে নিয়ে বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। ব্যঙ্গ চিত্র বের হল, গো-বসন্তের টিকা দেওয়ার ফলে মানুষের মাথা গরুর মাথা হয়ে গিয়েছে, মাথায় শিং গজিয়েছে। এ তো হল সাধারণ লোকের কথা। জেনার তাঁর পরীক্ষার বিবরণী রয়াল সোসাইটিতে পাঠালেন, রয়াল সোসাইটি থেকে তা ফেরত এল।

কিন্তু জেনার নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি সারা নেলমিস নামে এক গোয়ালিনীর হাতের গো-বসন্ত থেকে বীজ নিয়ে একটি আট

বৎসরের ছেলেকে প্রথম টিকে দেন ১৭৯৬ সালে। ছেলেটির নাম জেমস্ ফিপ্‌স্।

চারদিকে তখন বসন্ত হচ্ছে, কিন্তু দেখা গেল সেই ছেলেটির বসন্ত হল না। জেনারের এখন আর কোন সন্দেহ রইল না যে, তিনি মানব জাতিকে এক ভয়াবহ ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার উপায় বের করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর উপর বিদ্রূপ চলতেই থাকল। জেনার একটুও দমলেন না। তিনি তাঁর ছেলেকে তিন তিন বার টিকা দিলেন। নিকটে একটা গ্রামে অনেক গরিব লোক বাস করত, জেনার তাদের সকলকে টিকা দিয়ে দিলেন। লোকে দেখল, সে পাড়ার আর কারও আর বসন্ত হল না। তখন ধীরে ধীরে লোকে জেনারের মতে আস্থাবান হতে থাকল, দুএকজন সম্ভ্রান্ত লোক নিজেদের ছেলেমেয়েকে টিকা নেবার জন্য জেনারের কাছে আনতে আরম্ভ করলেন। জেনার নেপোলিঅনের বিশেষ প্রিয় হলেন, নেপোলিঅন নিজে টিকা নিলেন। একবার যুদ্ধে-বন্দী দুজন ইংরেজকে দেশে ফিরিয়ে দেবার জন্যে জেনার নেপোলিঅনের কাছে আবেদন করেন। নেপোলিঅন দরখাস্তখানা নামঞ্জুর করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, দরখাস্তখানা আসছে টিকার আবিষ্কারকের কাছ থেকে। নেপোলিঅন তৎক্ষণাৎ বললেন— ওই ব্যক্তিকে অদেয় আমার কিছু নেই ; বলে লোক দুজনকে ছেড়ে দিলেন।

এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জেনারকে সম্মানিত করতে থাকল, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট জেনারের পরীক্ষার জন্য তিরিশ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করল। কিন্তু একটা হাস্যকর ব্যাপার রয়ে গেল।

ইংলণ্ডের রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স ঠিক করলেন যে, জেনার যতদিন না গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষা পাস করেন ততদিন তাঁকে ওই প্রতিষ্ঠানের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হবে না। জেনার পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন।

জেনার যদি তাঁর আবিষ্কারের কথা বাইরে প্রকাশ না করতেন, তা হলে তিনি অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাজকে গোপন রাখলেন না। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে নানা প্রশ্ন আসতে লাগল, তিনি যথাযথ উত্তর দিতে থাকলেন, তাঁর পদ্ধতি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, কারণ তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা। তাঁর আবিষ্ক্রিয়ায় এ কল্যাণ সাধিত হল, টিকা নেবার পর বসন্ত রোগে মৃত্যু পৃথিবীতে আর বড় দেখা গেল না। অনেক দেশ আইন করে টিকা নেওয়াটা বাধ্য করল।

কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্যে বিজ্ঞানের যে মূল কথাটা ছিল লোকে তখনও তা জানল না।

পাস্তুর ও রোগের জীবাণু আবিষ্কার

জীবাণু আবিষ্কার জেনারের অনেক আগেই হয়েছিল।

জেনারের প্রায় এক শ বছর আগে হল্যাণ্ডে লিউএনহুক যেদিন তাঁর নিজের হাতের তৈরি অণুবীক্ষণ দিয়ে একটি জলের ফোঁটার দিকে তাকালেন, সেদিন মানুষের কাছে এক নতুন জগৎ দেখা দিল। মানুষ অবাক হয়ে গেল। এ জগৎ আগে কোনদিন সে দেখে নি আর খালি চোখে তা দেখাও যায় না। লিউএনহুকের

অণুবীক্ষণ ছিল মাত্র একখানি লেন্স, তবে সেই লেন্স এমন নিপুণভাবে তৈরি যে তা দিয়ে কোন জিনিস দেখলে সেটা প্রায় দেড় শ গুণ বড় দেখায়। লিউএনহুক জলের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু দেখতে পেলেন। জল ছাড়া নানা জিনিস তিনি তাঁর অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকলেন আর অনেক রকম জীবাণুর সন্ধান পেলেন। ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির সভ্যেরা তাঁর আবিষ্কারের যথাযথ মর্যাদা দিলেন, তাঁকে রয়াল সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করে নিলেন।

জেনার যে বছর মারা যান তার আগের বছর লুই পাস্তুর জন্মান।

লুই পাস্তুর ভাল রকম লেখাপড়া শিখে রসায়নবিদ্যার চর্চায় মন দেন। কিন্তু তাঁর এক খেয়াল ছিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুব ছোট ছোট জীব লক্ষ্য করা। লুইর অধ্যাপকেরা বলাবলি করতেন, ছেলেটা কী যে পাগলামি করে তার ঠিক নেই। কিন্তু এই দিকে মন দিয়ে ওই যুবক পৃথিবীকে যা দিয়ে গেলেন তাতে সকল দেশের সকল কালের সকল চিকিৎসকের ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান রইল, অথচ তিনি নিজে চিকিৎসক ছিলেন না।

চিনি গেঁজে ওঠে। কেন এরকম হয়? পাস্তুর অনুমান করলেন যে, চোখে দেখা যায় না এমন অতি ছোট ছোট জীব চিনিতে ওই পরিবর্তন ঘটায়। পাস্তুর অণুবীক্ষণ দিয়ে তাঁর কল্পিত জীবাণুর খোঁজ করলেন, তাদের দেখা মিলল। পরীক্ষা চলতে থাকল। পাস্তুর ওই সকল জীবাণুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, মিষ্টি জিনিসে ওরা হু হু করে বেড়ে চলে, কিন্তু টকে

তারা একেবারে কাবু হয়। পদার্থকে গাঁজিয়ে তোলবার কারণ হল ওই জীবাণু আর একথা যেদিন জানা গেল, সেদিন বর্তমান চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হল।

কিন্তু খালি চোখে দেখা যায় না এই যে জীবাণু এদের উৎপত্তি কোথা থেকে? অনেক রকম পরীক্ষার পর পাস্তর এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, পচবার কারণ, গেঁজে ওঠবার কারণ, হাওয়ার মধ্যেই আছে। কোটি কোটি জীবাণু বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত বাইরের অবস্থায় তারা খুব শীগ্‌গির শীগ্‌গির বেড়ে চলে। তিনি বললেন, জড় থেকে জীব কখন হয় না, একমাত্র জীব থেকেই জীব জন্মায়। একটি পচা জিনিসকে অনেকক্ষণ ধরে গরম করলেন। ভিতরের জীবাণু সব মরে গেল। এইবার তিনি ওটাকে এমন একটা পাত্রের মধ্যে রাখলেন যাতে বাইরে থেকে কোন জীবাণু না আসতে পারে। পাস্তর এখন দেখালেন যে ওতে আর জীবাণু জন্মাল না। দুধ যে কেটে যায় তা ওই জীবাণু আসার ফলে, একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তুললে সেই জীবাণুরা ধ্বংস পায়। মানুষের শরীরে যে ঘা হয়, জীবন্ত পেশীতে যে পচ ধরে, পাস্তর বললেন, তাও ওই অদৃশ্য জীবাণুর কাজ।

এ সময় আর একটা ব্যাপার ঘটল। ফ্রান্স ও ইটালি দেশে তখন রেশমশিল্প বেশ গড়ে উঠেছে। রেশমগুটিতে পোকা ধরতে আরম্ভ হল, একেবারে মড়ক দেখা দিল, অতবড় একটা শিল্প একেবারে যায় যায় এই রকম হল। পাস্তরের ডাক পড়ল। এর আগে পাস্তর রেশমের গুটি কোনদিন দেখেন নি, ওই কীটের জীবন-ইতিহাসের কোন কথা তিনি জানেন না। লোকে বিদ্রূপ

করে বলাবলি করতে লাগল, শেষে একজন রসায়নবিদ্ এর প্রতিবিধান করবে! পাস্তুর অণুবীক্ষণে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। যে জীবাণু ওই রেশমগুটির ধ্বংসের কারণ ছিল তার সন্ধান মিলল। ওই জীবাণু নাশ করবার উপায় স্থির হল। রেশমশিল্প আগের মতো চলতে থাকল।

পাস্তুরের অনুসন্ধানের বিরাম নেই। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাজ করে চলেছেন, রাত্রি এলে দুঃখ করে বলেন, এ সময়টা বৃথা গেল।

তখন প্রতি বছর হাজার হাজার গোরু-ভেড়া অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যেত। কখ্ নামে একজন জার্মানিবাসী বিজ্ঞানী অণুবীক্ষণে রোগগ্রস্ত গোরু-ভেড়ার রক্তে একপ্রকার জীবাণু লক্ষ্য করলেন। পাস্তুর প্রমাণ করলেন যে, ওই জীবাণুর জন্যই অ্যানথ্রাক্স রোগ জন্মায়, আর এও দেখালেন যে ওই জীবাণুর টিকা নিলে আর অ্যানথাক্স রোগ হবে না। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় জেনারের যে অবস্থা হয়েছিল পাস্তুরেরও সেই দশা ঘটল, কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিল না। শেষে সকল লোকের সামনে এক বিশেষ পরীক্ষায় পাস্তুরের মত যাচাই করার ব্যবস্থা হল। পরীক্ষাটা এই রকম—

পঞ্চাশটি ভেড়া নেওয়া হল। পাস্তুরের নির্দেশ অনুসারে পঁচিশটি ভেড়ার গায়ে মৃদু অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর ইনজেক্‌সন্ (টিকা) দেওয়া হল। কয়েকদিন পরে ওই পঁচিশটি ভেড়ার, আর টিকা দেওয়া হয় নি এরূপ বাকি পঁচিশটি ভেড়ার শরীরের রক্তে তীব্র অ্যানথ্রাক্স জীবাণু প্রবেশ করান হল। পাস্তুর বলে পাঠালেন যে, আগে

টিকা দেওয়া হয়েছে যে পঁচিশটি ভেড়াকে, তাদের কিছুই হবে না, আর টিকা দেওয়া হয় নি বাকি ভেড়াগুলি নিশ্চয়ই মারা যাবে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন এল, সাধারণ সংস্কার বা বৈজ্ঞানিক তথ্য কোন্‌টা জয়যুক্ত হবে! ১৮৮১ সাল, ২ জুন। পাস্তরের মতের স্বপক্ষের ও বিপক্ষের লোক সমবেত হলেন। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে চিকিৎসাবিভাগের, স্বাস্থ্যবিভাগের, পশুপালনবিভাগের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত। অপরাহ্ণ ছুটোর সময় তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পাস্তর উপস্থিত হলেন। আগে টিকা দেওয়া হয় নি এই রকম বাইশটি ভেড়ার মৃতদেহ পর পর সাজান, ছুটি যায় যায় অবস্থায়, বাকি একটির রোগ দেখা দিয়েছে (সেটিও সেই রাত্রে মারা যায়); আর টিকা নেওয়া পঁচিশটি ভেড়ার প্রত্যেকটি সুস্থ অবস্থায় রয়েছে।

পাস্তর বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করলেন যে টিকা দিয়ে কয়েকটি রোগের আক্রমণ রোধ করা যায়। কোনো রোগের টিকা হল সেই রোগের মৃছ জীবাণু। ওই জীবাণু দেহের মধ্যে গিয়ে রক্তের শ্বেতকণিকাকে উত্তেজিত করে রাখবে, ভবিষ্যতে তীব্র জীবাণু আসলে শ্বেতকণিকা তাদের আক্রমণ রোধ করবে। গোরুর বসন্ত থেকে জীবাণু নেবার অর্থ ছিল তাদের শক্তি ছিল কম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রক্তের শ্বেতকণিকার কাজই হল রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে দেহকে সর্বদা রক্ষা করা। জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধে শ্বেতকণিকারা যখন হেরে যায় তখনই রোগ জন্মে এবং তখন তারা পুঁজের আকার ধারণ করে।

মানুষের বসন্ত থেকে জীবাণু নিয়ে টিকা দিলে কি হবে?

প্রথম প্রথম কোন কোন জায়গায় এই রকম করা হত, তাতে টিকা দেওয়ার ফলে প্রবল বসন্ত রোগ দেখা দিত, সময় সময় মানুষ তাতে মারাও যেত। কিন্তু যারা বেঁচে থাকত তাদের প্রতিরোধশক্তি অনেক দিন বজায় থাকত। জেনারের আবিষ্কারের অনেক আগে থেকে আমাদের দেশে যে বাঙলা টিকা দেওয়া হত সেও এই রকম ছিল। এখন কিন্তু আর এরকম করা হয় না। এখন গো-বসন্ত থেকে জীবাণু এনে দেওয়া হয়, তাতে টিকা দেবার সময় কোন বিপদ ঘটে না। তবে এতে প্রতিরোধক্ষমতা খুব বেশি দিন স্থায়ীও হয় না। সেই কারণে মাঝে মাঝে টিকা নেবার প্রয়োজন হয়।

কুকুরের এক রকম রোগ হয়, সেই রোগগ্রস্ত কুকুর, যাকে আমরা পাগলা কুকুর বলি, যদি মানুষকে কামড়ায় তবে মানুষের জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়, আর জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু অনিবার্য। অ্যানথাক্স সম্বন্ধে গবেষণার পর পাস্তুর এই দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন, আর শেষ অবধি এই জলাতঙ্ক রোগ সারাবার উপায়ও বের করলেন। কেবল এই কাজের জন্য চিরদিন পাস্তুর সমগ্র মানবজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

পাস্তুর প্রথম অণুবীক্ষণে কুকুরের রক্তে এই জীবাণুর সন্ধান করলেন। সন্ধান মিলল না। কিন্তু বসন্ত রোগের জীবাণুরও তো সন্ধান মেলে নি। না মিললেও টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে বসন্ত রোগকে ঠেকান সম্ভব হয়েছে। এখানেও তো সে রকম করা যেতে পারে। পাস্তুর প্রথম কুকুর নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কুকুরের দেহের রক্তে মৃদু জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিয়ে

তাকে ওই ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু মানুষকে নিয়ে তো পরীক্ষা করতে হবে। কোন লোককে পাগলা কুকুরে কামড়ালে পনর দিন থেকে সাত আট মাসের মধ্যে ওই রোগ দেখা দেয়। পাস্তর ভাবলেন, এই সময়ের মধ্যে ওই লোকের দেহের রক্তে যদি মৃদু থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ তীব্র জীবাণুর টিকা দিতে থাকা যায়, তাহলে যথাসময়ে পাগলা কুকুর থেকে আসা জীবাণু বাধা পাবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পরীক্ষা কী করে করা যায়। একজন সুস্থ মানুষকে ধরে এনে তো পরীক্ষা চলে না।

একটা সুযোগ এল। একদিন পাস্তরের পরীক্ষাগারে জোসেফ মিস্টার নামে একটি মেষপালক ছেলেকে আনা হল—দুদিন আগে তাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে। পাস্তর তার দেহে ওই জাতীয় জীবাণুর টিকা ইনজেক্‌সন্ করে যেতে আরম্ভ করলেন। দশ দিন চিকিৎসা চলল, দশ দিনে বারো বার ইনজেক্‌সন্ দেওয়া হল, মৃদু থেকে ক্রমশ তীব্র টিকা দেওয়া হতে থাকল। পাস্তরের পরীক্ষা সফল হল, বালকের ওই রোগ আর দেখা দিল না।

পাস্তর ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে একটি মর্মরমূর্তি রাখা হয়েছে, একটা কুকুর একটি মেষপালক ছেলেকে আক্রমণ করছে, ছেলেটি বাধা দিচ্ছে।

পাস্তর জনসমাজে কি রকম সম্মানিত হয়েছিলেন দুএকটা ঘটনা থেকে জানা যায়। ১৮৮২ সালে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা কন্‌গ্রেসের এক অধিবেশন হয়। ফ্রান্স পাস্তরকে প্রতিনিধি করে পাঠালেন। মণ্ডপে লোকে লোকারণ্য। পাস্তর প্রবেশ করলেন, সঙ্গে তাঁর ছেলে ও জামাই। প্রবেশ করামাত্র সেই

জনসমুদ্র থেকে বিপুল জয়ধ্বনি উঠল। পাস্তুর এর কারণ বুঝতে না পেরে তাঁর তরুণ সঙ্গী দুজনকে বললেন— বোধহয় প্রিন্স অফ্ ওএলস আসছেন, আমাদের একটু আগে আসা উচিত ছিল। কন্‌গ্রেসের সভাপতি কাছেই ছিলেন, তিনি বললেন— না, আপনার আগমনে এই হর্ষধ্বনি। আর সে ধ্বনি উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে লাগল। একবার খবরের কাগজে একটি প্রশ্ন বেরল— ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কে? ফ্রান্সের বহু অধিবাসী এ প্রশ্নের উত্তর দিল। গণনায় দেখা গেল, পাস্তুরের নাম সবপ্রথম, নেপোলিঅনের নাম দ্বিতীয় আর ভিক্টর হুগোর নাম তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। হক্সলি একটা কথা বলেছিলেন— ১৮৭০ সালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সকে যে পরিমাণ খেসারৎ দিতে হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি টাকা ফ্রান্সের ঘরে এল পাস্তুরের আবিষ্কার থেকে।

আজ যদি সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পাঁচ জন বিজ্ঞানীর নাম করা হয়, তবে নিশ্চয়ই পাস্তুরের নাম তার মধ্যে থাকবে। আর সমগ্র মানবজাতির সবচেয়ে বেশি কল্যাণসাধন করেছে কে, এ প্রশ্নের উত্তরে পাস্তুরেরই নাম করতে হবে।

তৃতীয় নেপোলিঅন বলেছিলেন, পাস্তুর তো তাঁর আবিষ্কার দিয়ে অনেক টাকা করতে পারতেন, তা তিনি করেন নি কেন? পাস্তুর উত্তর দেন, আমি বিজ্ঞানের জন্য খেটে যেতে পারি কিন্তু টাকার জন্য কাজ করছি ভাবলে আমার হাত আর চলে না।

১৮৮৮ সালে পাস্তুরের নামে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হল।

জীবাণু সম্বন্ধে সেখানে নানা রকম গবেষণা চলতে থাকল। মেচনিকফ, রাউকস প্রভৃতি পাস্তুরের ছাত্র এখানে কাজ করতে থাকলেন। এক সময় রাউকস ডিপথেরিয়ারোধী সিরম আবিষ্কার করায় তাঁকে চার হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি সমস্ত টাকাটা পাস্তুর ইনস্টিটিউটকে দিয়ে দিলেন। অসিরিস এই পুরস্কারটা দেন, তিনি রাউকসকে ডেকে পুরস্কার গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাউকস উত্তর দিলেন, আমার যা কিছু পরীক্ষা এই ইনস্টিটিউটেই করেছি, আর ইনস্টিটিউটের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। অসিরিস তখন চুপ করে রইলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর সম্পত্তির অনেকটা অংশ তিনি পাস্তুর ইনস্টিটিউটকে দান করে গিয়েছেন।

১৮৯৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর পাস্তুরের মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিক্ষেত্রের জন্য এই গবেষণাগারই ঠিক করা হল।

গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে অতিবৃহৎ-এর পরিচয় দিয়ে অমর হয়েছেন। পাস্তুর অণুবীক্ষণ দিয়ে অতিক্ষুদ্রের পরিচয় দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

আজ পৃথিবীর সকল দেশে পাস্তুর-প্রবর্তিত চিকিৎসাপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। পাস্তুর দেখেছিলেন যে, কুকুরের যে জলাতঙ্ক রোগ হয় তা বাসা বাঁধে কুকুরের মস্তিষ্কে। তাই তিনি ঠিক করেছিলেন যে কোন সুস্থ জন্তুর শরীরে রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলে ওই জন্তুর মস্তিষ্কে রোগ জন্মাবে আর প্রাণীটি নির্দিষ্ট দিনে মারা যাবে। পরে দেখলেন কুকুরের ন্যায় ভেড়াও ওই রোগে আক্রান্ত হয় আর ভেড়া নিরীহ জীব। তাই এখন

ভেড়ার শরীরে জীবাণু দেওয়া হয়, ভেড়া রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, তখন তার মস্তিষ্ক নিয়ে নির্দিষ্ট শক্তির টিকা তৈরি করা হয়। এইরকম টিকার ১৪টা ইনজেক্‌সন্ নিলে কুকুরে-কামড়ান রোগী রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কলকাতা পাস্তর ইনস্টিটিউটের বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন গবেষক এইরকম টিকা প্রস্তুতের সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করেছেন।

পাস্তরের পরবর্তিগণ

দুটো কথা চলতি আছে, একটা হল— রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জিতল লর্ড লিস্টারের জন্যে। অপরটা হল— পাস্তর পানামা খাল কাটলেন।

কিন্তু কথা দুটো কেমন হল? লর্ড লিস্টার হলেন ইংলণ্ডের লোক, আর জাপানের প্রতি ইংলণ্ডের যে কোনদিন দরদ ছিল তা নয়। অন্য দিকে পাস্তরের মৃত্যুর অনেক পরে পানামা খাল কাটা হয়। সুতরাং পাস্তর পানামা খাল কাটলেন, এই বা কি রকম কথা!

পাস্তর ছিলেন ফ্রান্স দেশের লোক, কিন্তু তাঁর কাজে তাঁর শিষ্যত্ব নিলেন ইংলণ্ডের লিস্টার আর জার্মানির কখ্।

ক্লোরোফর্‌ম্ যখন বের হল, তখন শস্ত্র-চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে রোগীর ভয় অনেকটা কম্‌ল, শস্ত্র-চিকিৎসার সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকল। এই ক্লোরোফর্‌ম্ আবিষ্কারে একটা মজার ব্যাপার ছিল। সিম্পসন বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ডুমাকে

দিয়ে এক বোতল ক্লোরোফর্‌ম্ তৈরি করালেন, এর ফলাফল পরীক্ষা করবেন। রাত্রে দুই বন্ধুকে খেতে বলেছেন। তাঁরা উপস্থিত, সামনে খাবার সাজান। ঠিক হল, ক্লোরোফর্‌ম্ শুঁকলে কী হয় আগে দেখা হবে। তিনটে গেলাসে ক্লোরোফর্‌ম্ ঢেলে তাঁরা শুঁকতে থাকলেন। এলোমেলো কথা, মাথা ঘুলিয়ে গেল, তারপর কি হল তাঁরা জানেন না। ধপাধপ শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে মিসেস্ সিম্পসন ছুটে এসে দেখেন তিন বন্ধু মেঝেতে পড়ে অজ্ঞান। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের জ্ঞান হল। মিসেস্ সিম্পসনের তখনও ভয় যায় নি, সিম্পসন কিন্তু আনন্দে অধীর, শস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রণা থেকে তিনি মানুষকে মুক্তি দিতে পেরেছেন। সে যাক, দেখা গেল রোগীর সংখ্যা যত বাড়ছে, মৃত্যুসংখ্যাও তত বেড়ে চলেছে, কাটাকুটির পর স্থানটা ফুলে ওঠে, ঘা সারতে চায় না, জায়গাটা পচতে আরম্ভ হয়, রোগী মারা যায়।

পাস্তুর পরীক্ষায় দেখিয়েছেন, চিনি গেঁজে ওঠে, দুধ ছিঁড়ে যায় বাতাসের জীবাণুর জন্যে। লিস্টার ভাবলেন, ওই রকমের জীবাণুই কি ক্ষতস্থান পচায়। লিস্টার ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ শস্ত্র-চিকিৎসাবিদ্। তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। লিস্টার দেখলেন, কার্বলিক অ্যাসিড ওই জীবাণুদের মেরে ফেলে। তিনি ক্ষতস্থানে কার্বলিক অ্যাসিড দিলেন, বাতাসে কার্বলিক অ্যাসিডের বাষ্প ছড়ালেন, কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে হাত ধুলেন, যন্ত্রপাতি মুছলেন, এই রকম করে তিনি আশ্চর্য রকম ফল পেতে থাকলেন। তিনি দুটো ব্যাপারকে পৃথক্ করলেন। যেখানে জীবাণু আসায় ক্ষতস্থান দুষ্ট হয়েছে সেখানে ওই জীবাণুদের মারতে হবে, আর

যেখানে অক্ষত জায়গাকে কাটতে হবে, সেখানে জীবাণু যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে বলতেন— মনে কর চারদিকে কাঁচা রং লেগে রয়েছে, তোমাকে যেমন সন্তর্পণে চলতে হবে, এখানেও মনে রাখবে চারদিকে জীবাণু ছড়িয়ে রয়েছে, ক্ষতস্থানে তারা না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পাস্তুরের মূল কথাগুলি লিস্টার শস্ত্রবিদ্যায় লাগালেন, শস্ত্রবিদ্যা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। জীবাণু ধ্বংস করবার বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হতে থাকল। আজ এমন সব শস্ত্র-চিকিৎসা চলছে লিস্টারের আগে যার সম্ভাবনার কথা লোকে ভাবতেই পারত না।

রয়াল সোসাইটির অধিবেশনে লিস্টারকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, তাতে আমেরিকার দূত লিস্টারকে সম্বোধন করে বলেন— শুধু চিকিৎসক সম্প্রদায় নয়, কেবলমাত্র একটি জাতি নয়, সমগ্র মানবসমাজ নতমস্তকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানীর আর-একদিন আনন্দের সীমা ছিল না। হাসপাতালে একটি ছোট মেয়ের হাতের অর্ধেকটা কেটে ফেলতে হয়। লিস্টার প্রত্যহ তার হাত ধোয়ানো ওষুধ লাগানোর ভার নিলেন, যদিও এ কাজ করবার লোক হাসপাতালে অনেক ছিল। মেয়েটি মুখ বুজে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে যেত। একদিন মেয়েটি তার ফ্রকের ভিতর থেকে একটি পুতুল বের করে লিস্টারের হাতে দিল, পুতুলের পা এক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে, সেখান থেকে কাঠের গুঁড়ো বেরচ্ছে। লিস্টার গম্ভীরভাবে পুতুলটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, তারপর ছুঁচ

সুতো দিয়ে পুতুলের পা সেলাই করতে বসে গেলেন, সেলাই করে পুতুলটি মেয়েটির হাতে দিলেন। সেদিন মেয়েটির মুখের হাসির রেখা এই কোমলপ্রাণ বিজ্ঞানীকে যে আনন্দ দিয়েছিল, পৃথিবীতে তা সচরাচর মেলে না।

১৮৯২ সালে পাস্তুরের বয়স যখন সত্তর হল, তখন তাঁকে অভিনন্দন দেবার জন্য পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা সমবেত হলেন। ইংলণ্ড পাঠালেন লিস্টারকে। সভায় মানবজাতির প্রভূত কল্যাণকারী দুই মহাপুরুষের মিলন হল।

লিস্টারের উদ্ভাবিত পদ্ধতি কাজে লাগাতে ইউরোপ দেরি করল, আর ইউরোপ যাকে বিদ্রূপ করত, হীন চক্ষে দেখত, সেই জাপান অবিলম্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে নিয়ে নিল। এই কারণে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের সৈন্যক্ষয় হল খুব কম, আর সেইটে হল জাপানের জয়লাভের প্রধান কারণ।

ফরাসি পাস্তুর যে পথ আবিষ্কার করলেন সেই পথে এগিয়ে চললেন জার্মানির কখ্। কখ্ কলেরা ও যক্ষ্মারোগের জীবাণুর পরিচয় পেলেন। কলেরার জীবাণু আবিষ্কার এক বিস্ময়কর কাহিনী। ১৮৮৩ সালে কি রকম করে ইজিপ্টে কলেরা দেখা দিল। হঠাৎ তা ভীষণ আকার ধারণ করল। সকালে রোগে ধরে, সন্ধ্যার মধ্যে জীবন শেষ হয়, রাস্তাঘাটে মড়ার ছড়াছড়ি। পাশে ইউরোপে দারুণ আতঙ্ক দেখা দিল। পাস্তুর ও কখ্ কলেরার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কখ্ একজন সহকর্মী ও অণুবীক্ষণ প্রভৃতি নিয়ে আলেক-জেন্‌ড্রিয়া শহরে এসে পৌঁছলেন। পাস্তুর তখন জলাতঙ্ক
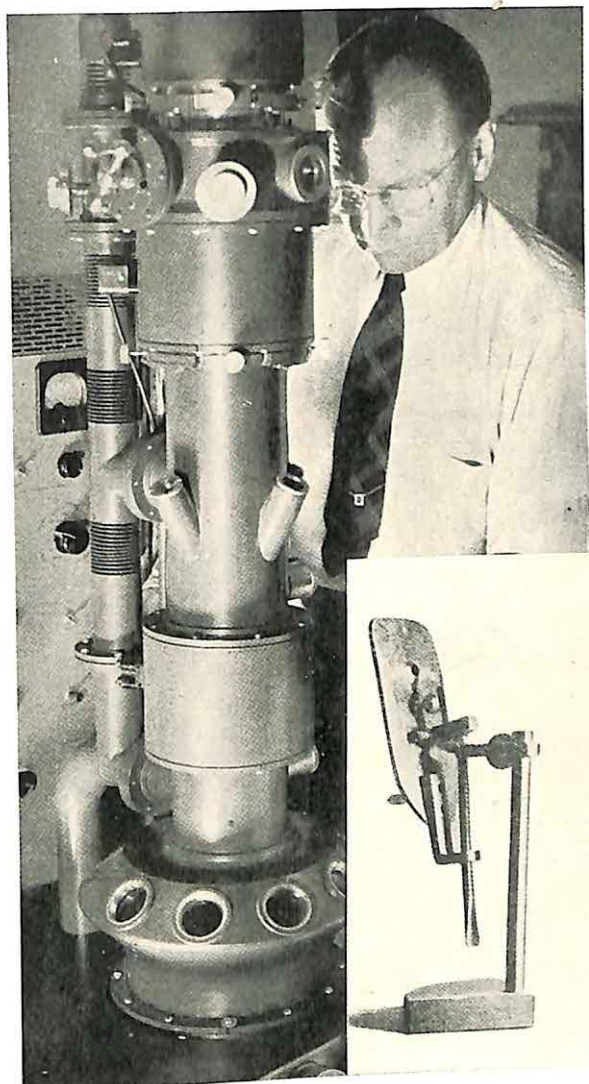
লিউএনহুক-নির্মিত প্রথম অণুবীক্ষণযন্ত্র (ডান দিকের কোণে) ও
আধুনিক ইলেক্‌ট্রন-অণুবীক্ষণযন্ত্র
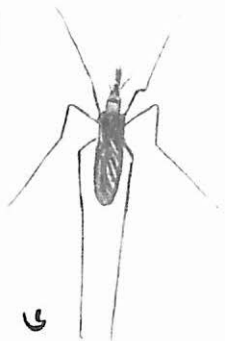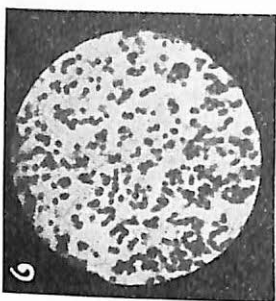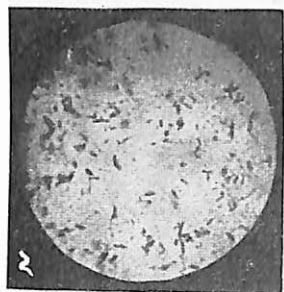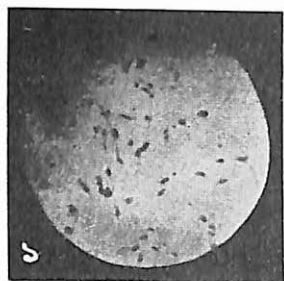
১ প্লেগ জীবাণু, ২ যক্ষ্মা জীবাণু, ৩ ম্যালেরিয়া জীবাণু, ৪ প্লেগের জীবাণু বহনকারী ইঁদুরের গায়ের পোকা, ৫ জীবাণু বহনকারী মাছির পা, ৬ ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী অ্যানোফিলিস মশা, ৭ পীতজ্বর জীবাণু বহনকারী মশা
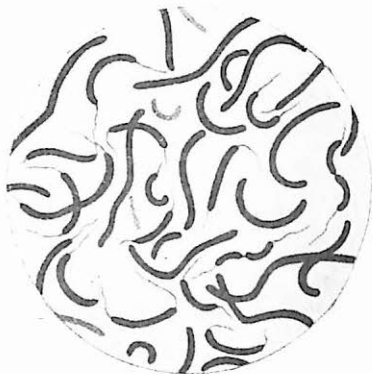
কলেরার জীবাণু
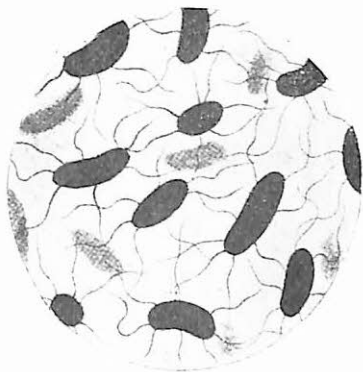
টাইফয়েডের জীবাণু

এক গুচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাই জীবাণু
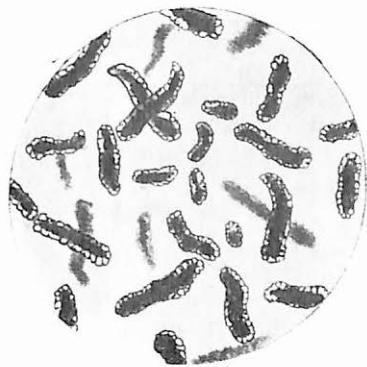
ডিপথেরিয়ার জীবাণু

একটা জীবাণু ভেঙে কি করে চারটেয় দাঁড়ায়
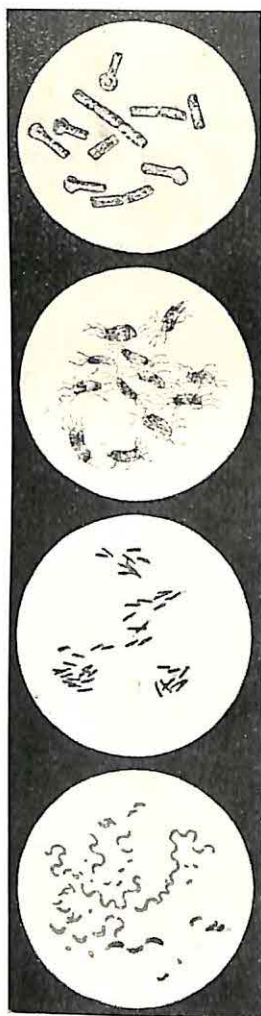
কলেরা　　যক্ষ্মা　　টাইফয়েড　　ধনুষ্টংকার

অণুবীক্ষণযন্ত্রে মানুষের বিভিন্ন অদৃশ্য শত্রুর আকৃতি এইরূপ দেখা যায়

রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তিনি রাউকস্ ও থুইলিআরকে পাঠালেন। দুদলই কাজ আরম্ভ করল। কিন্তু কলেরা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি প্রায় হঠাৎ চলে যাবার মতো হল। প্রত্যেকেই যে যার দেশে ফিরব ফিরব করছেন, এমন সময় একদিন থুইলিআরের কলেরা হল, আর তিনি তাতেই মারা গেলেন। এদিকে কখ্ কলেরা রোগীর পাকস্থলীতে ইংরেজি চিহ্ন কমা(,)র মতো একটা নতুন রকমের জিনিস লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু তারাই যে কলেরার কারণ সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। ইজিপ্টে কলেরা থেমে যাওয়ায় আর অনুসন্ধানের সুযোগ মিলল না। কখ্ বার্লিনে ফিরে এসে কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে আরও পরীক্ষার দরকার, আর সেজন্য তিনি ভারতবর্ষে যেতে চান, ভারতবর্ষে কলেরা লেগেই আছে। কখ্‌কে ভারতবর্ষে পাঠান স্থির হল। থুইলিআরের মৃত্যু চোখের উপর দেখেও এক অজানা ব্যাধিসংকুল দেশে কখ্ চলে এলেন। এসেই কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের হাস-পাতালে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কলকাতায় অবশ্য তিনি অল্পসময় ছিলেন কিন্তু তারপর বহু পরীক্ষার পর তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে, এই কমা(,)জীবাণুরাই কলেরার কারণ। দেশে ফিরে গিয়ে জোর করে জানালেন যে কোন সুস্থ লোকের কলেরা হতে পারে না, যদি না তার পেটের মধ্যে ওই জীবাণু চলে যায়। কলেরা কিসে হয় জানার পর টিকা দিয়ে কি করে এর আক্রমণ রোধ করা যায় তাও জানা গেল। এখন এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের একটা মস্ত দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে। প্রধানত ভারত-

বর্ষে এই রোগের উৎপত্তি। এখানেই এর সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হলে তবেই সমস্ত পৃথিবী থেকে ওই রোগ চলে যাবে। আজকাল অবশ্য অন্যান্য দেশ অনেক এগিয়ে গেছে তবুও এমন দেশ আছে, যথা ইজিপ্ট, সেখানে কলেরায় মৃত্যুহার ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশি। তবে ভারত যদি এই রোগ নিবৃত্ত করতে পারে তবে সে অন্য দেশের আদর্শস্থানীয় হবে ও ভারতের অনুসরণ করে কলেরা দূর করা সম্ভবপর হবে।

জীবাণুকে রক্ত থেকে পৃথক করা, তাদের বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা, এসব ব্যাপারে কখের দান অসাধারণ। এইজন্য কখ্‌কে জীবাণু বিদ্যার জনক বলা হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটা বড় কৃতিত্ব হল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিশিষ্ট ব্যাধিগুলির কারণ নির্ণয় করা আর সেগুলি দূর করবার উপায় বের করা। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে প্রধান হল ম্যালেরিয়া। এই রোগ কত বছর ধরে কত লোককে যে শেষ করে ফেলেছে, আর তার চেয়ে কত বেশি লোককে যে অকর্মণ্য করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

ইংরেজিতে ম্যালেরিয়া কথাটার মানে হল খারাপ বাতাস। কিন্তু ফরাসি চিকিৎসক লাভেরান প্রথম দেখালেন যে, খারাপ বাতাস ম্যালেরিয়ার কারণ নয়, জলা জায়গাও নয়, ম্যালেরিয়ার কারণ হল এক রকমের জীবাণু।

আগে যে জীবাণুদের কথা বলা হয়েছে তারা আর এই ম্যালেরিয়ার জীবাণু একেবারে ভিন্ন শ্রেণীর। আমরা জীবকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করি— প্রাণী ও উদ্ভিদ। প্রাণী-শ্রেণীর জীবাণুকে

বলা হয় প্রোটোজোয়া, আর উদ্ভিদ-শ্রেণীর জীবাণুকে বলা হয় ব্যাক্‌টিরিয়া, তবে তাদের ক্লোরোফিল নামে পদার্থ থাকে না। উভয়ই জীবাণু।

ব্যাকৃটিরিয়াদের চেয়ে এই প্রোটোজোয়ারা কিছু বড় হলেও খালি চোখে এদেরও দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে হয়। এরা দেহের রক্তে লালকণিকায় বাসা বাঁধে আর হু হু করে বেড়ে চলে, রক্তের লালকণিকা ধ্বংস করে, আর যে বিষ তৈরি করে তার জন্য জ্বর দেখা যায়। ম্যান্‌সন এ সম্বন্ধে কিছু অনু-সন্ধান করলেন, আর তার কাজ উৎসাহিত করল রনাল্ড রস্‌কে। মশার দেহে যে জীবাণুর কথা লাভেরান বলেছিলেন, রস্ ভারতবর্ষে এসে তার সন্ধান করতে থাকলেন। সেকেন্দরাবাদ শহরে তিনি এক রকম মশা দেখতে পেলেন যা সাধারণ কিউলেক্স শ্রেণীর মশা নয়। ম্যালেরিয়া-রোগীকে কামড়েছে এই রকম এই জাতীয় কয়েকটি মশা নিয়ে রস্ অণুবীক্ষণে তাদের পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রত্যহ আট ঘণ্টা করে অণুবীক্ষণ নিয়ে কাজ চলেছে। নতুন কিছুই পান না। আর মাত্র দুটো মশা বাকি, চোখ ক্লান্ত, দেহ অবসন্ন। হঠাৎ একটা মশার পাক-স্থলীতে একটা রকমারি কিছু দেখলেন, যে রকম তিনি পূর্বে দেখেন নি। কিন্তু এর মূল্য তখন তিনি বুঝলেন না, বাড়ি ফিরে গেলেন, ঘণ্টাখানেক ঘুমুলেন। ঘুম থেকে উঠে প্রথম কথা তাঁর মনে হল যে একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই জাগরণে রসের জীবনে এক স্মরণীয় মুহূর্ত এল, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক শুভ মূহূর্ত দেখা দিল।

কোন্ পথ দিয়ে চলে ম্যালেরিয়া বিষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে আক্রমণ করছে, রস্ তা দেখিয়ে দিলেন। একজন ম্যালেরিয়া-রোগীর রক্তে বিশেষ রকমের জীবাণু জন্মায়। এরা কোনো রকমে যদি অপর একজন সুস্থ লোকের রক্তে গিয়ে পৌছতে পারে তবে তাকে ম্যালেরিয়ায় ধরবে। কিন্তু কি করে ওরা পৌছবে, কে ওদের বয়ে নিয়ে যাবে। রস্এর পরীক্ষায় দেখা গেল যে অ্যানোফেলিস্-জাতীয় মশা এই কাজ করছে। এই মশা একজন ম্যালেরিয়া-রোগীকে কামড়াল, রক্তের সঙ্গে জীবাণু মশার শরীরে চলে গেল। রস্ দেখলেন যে, মশার শরীরে এসে ওরা হু হু করে বেড়ে যেতে থাকল। এখন এই মশা যদি একজন সুস্থ লোককে কামড়ায়, তবে সেই লোকের শরীরে জীবাণু চলে যাবে, তার ম্যালেরিয়া হবে। সুতরাং একজন লোকের ম্যালেরিয়া হতে গেলে প্রথম আর একজন লোকের ম্যালেরিয়া হওয়া চাই, তারপর অ্যানোফেলিস্-জাতীয় মশার ওই ম্যালেরিয়া-রোগীকে কামড়ে সুস্থ লোককে কামড়াতে হবে। এর কোন জায়গায় একটি ছেদ হলে ম্যালেরিয়া হবে না। অর্থাৎ ধরা যাক্, অ্যানোফেলিস্ মশা আছে, কিন্তু আশে-পাশে কোন ম্যালেরিয়া-রোগী নেই। তাহলে কারও ম্যালেরিয়া হবে না। আবার মনে করা যায়, ম্যালেরিয়া-রোগী আছে, কিন্তু একটিও অ্যানোফেলিস্ মশা নেই। তাহলেও অন্য কারও ম্যালেরিয়া হবে না।

রস্ যেদিন তাঁর আবিষ্কার সম্পূর্ণ করলেন, সেদিন তিনি আনন্দে একটি কবিতা রচনা করেন। তার শেষের দু-লাইন এই—

I know this little thing a myriad men will save,
O Death! where is thy sting? thy victory, O Grave!

ম্যালেরিয়া কি করে আসে যখন জানা গেল তখন তাকে ঠেকানো আর শক্ত রইল না। প্রথম কুইনিন খাইয়ে যতটা পারা যায় ম্যালেরিয়া-রোগীর রোগ সারান হতে থাকল, তারপর ওই বাহক অ্যানোফেলিস্ মশাকে নির্মূল করার ব্যবস্থা হল। এদের ভাল করে চেনা গেল, এদের জীবন-ইতিহাস জানা গেল। এদের মারতে কামান দাগা হল না বটে, কিন্তু ডিম থেকে আরম্ভ করে কীট অবধি বিভিন্ন অবস্থায় এদের শেষ করে ফেলতে নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হল। ফলাফল কি হল, কয়েকটি জায়গার ইতিহাস থেকে তা বোঝা যাবে। রস্এর প্রবর্তিত পথে কাজ করে, ইটালিতে, যেখানে বছরে মৃত্যুর হার ছিল ষোল হাজার, সাত বছরে তা কমে এসে চার হাজারে দাঁড়াল। গ্রীসের ম্যারাথনে মৃত্যুর হার শতকরা আটানব্বই থেকে দুইতে নামল। পৃথিবীর নানাস্থানে স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে উঠল, যে স্থানগুলি আগে ছিল 'সাদা মানুষের কবর'।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি। এখানে বছরে বহু লক্ষ লোক জ্বরে মারা যায়, আর সে জ্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া। মারা যায় যত লোক তার সাত-আট গুণ লোক জ্বরে ভোগে। যারা ভোগে তাদের কর্মশক্তি কমে যায়, জীবনে অবসাদ আসে। শুধু মানবতার দিক থেকে নয়, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে স্বাধীন ভারতের সবপ্রধান কাজ হবে দেশ থেকে এই রোগকে একেবারে দূর করা। রস্এর আবিষ্কার এই ভারতবর্ষেই

হয়েছিল, তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করে অন্য দেশ এগিয়ে গিয়েছে, ভারতবর্ষ পেছিয়ে থাকতে পারে না।

নতুন পৃথিবীতে একটা রোগ ছিল, পীতজ্বর। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে আমেরিকার বহু সৈন্য এই রোগে মারা যায়। যুক্তরাজ্যের সভাপতি কিউবা দ্বীপে পীতজ্বরের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য ওআলটার রীডের নেতৃত্বে পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁরা অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। কয়েকটি ঘটনা দেখে তাঁরা অনুমান করলেন যে, এক রকমের মশা দিয়েই এই রোগ চালিত হয়। কিন্তু মুশকিল এই যে, ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত কোনো জীবের দেহে এই রোগ সংক্রমণ করা যায় না এবং সেইজন্যই এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করা দুরূহ। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে সত্যই মশার দংশনে এই রোগ হয় কি না সে পরীক্ষা মিশনের সভ্যরা নিজেরাই করবেন। প্রথম স্বেচ্ছাসেবক হলেন মিশনের অন্যতম সভ্য জেস্ ল্যাজিআর ও জেম্স্ ক্যারল। দুজনেরই বাড়িতে আছে স্ত্রীপুত্রপরিবার কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করলেন। এই পরীক্ষায় ল্যাজিআর প্রাণ দিলেন। কিন্তু আরও পরীক্ষা চাই।

কিসেন্‌জার নামে একজন সৈন্য আর সেনা বিভাগের একজন কেরানি, নাম মোরান, রীডের কাছে এসে বললে, আমাদের উপর পরীক্ষা হোক। রীড তাঁদের বিপদের কথা বললেন, জানালেন যে, প্রাণহানিও ঘটতে পারে। তারা বললে, আমরা জানি, আর জেনেই এসেছি। তাদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে রীড বললেন। লোক দুজন ফিরে চলল, বলল, পুরস্কারের লোভে

আমরা আসি নি। রীড তাদের ডাকলেন, আর নত হয়ে বললেন— ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করি।

কিন্তু পীতজ্বর কি অন্য রকমে ছড়িয়ে পড়ে, রীড চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করলেন যা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু যাতে ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। রীড দুটো ঘর তৈরি করালেন। একটা ঘর অত্যন্ত অপরিষ্কার, আর সে ঘরে পীতজ্বরে মারা গিয়েছে এই রকম লোকের বিছানা-পত্র ছড়ান, তবে সে ঘর তারের জাল দিয়ে ঘেরা, কোন মশা ঢুকতে পারবে না। অপর ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে, কিন্তু সে ঘরে একটি জালের বাক্সে কতকগুলি স্টেগোমায়া-জাতীয় মশা আছে, তারা আগে পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীকে কামড়েছে, রাত্রে লোক শোবার পর ওই মশাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। রীড বললেন, আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তবে প্রথম ঘরে যে শোবে তার কিছু হবে না, আর দ্বিতীয় ঘরে যাকে মশা কামড়াবে তার নিশ্চয়ই পীতজ্বর হবে। তিনজন সৈন্য প্রথম ঘরে গিয়ে শুতে থাকল। তাদের একজন মৃতের পায়জামা পরে শুতো। পর পর কুড়ি রাত্রি তারা ওই ঘরে বাস করল। তাদের কিছুই হল না। আর যে দুজন সৈন্য পরীক্ষার জন্য রীডের কাছে এগিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে মোরান বললেন— আমি ওই দ্বিতীয় ঘরে শোব। তিনি সেই ঘরে গেলেন, গিয়ে মশার বাক্সের দরজা খুলে দিলেন। মশারা বেরিয়ে এসে তাঁকে কামড়াল। কয়েকদিনের মধ্যে মোরান দারুণ পীতজ্বরে আক্রান্ত হলেন। শেষ অবধি তিনি বেঁচে উঠলেন। রীডের আনন্দের সীমা রইল না।

সত্য আবিষ্কৃত হল। পীতজ্বরের জীবাণু থেকে টিকা তৈরি হল, তা দিয়েই ওই রোগের আক্রমণ রোধ করা হতে থাকল। এই অনুসন্ধানে ল্যাজিআর প্রাণ দিলেন, কয়েকজন প্রাণ দিতে এগিয়ে গেলেন। লোক এঁদের কথা ভুলল, কিন্তু এঁরা পৃথিবীর অসংখ্য লোকের জীবনরক্ষা করে গেলেন। আজ পৃথিবীতে পীতজ্বর নেই বললেই হয়।

শেষ অবধি বিজ্ঞানী দেখল যে, দু রকমের মশা তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে রাখে দু রকমের জীবাণু, আর তারা এতদিন পৃথিবী থেকে বছর বছর লক্ষ লক্ষ লোক সরিয়ে দিয়ে আসছিল।

পানামা খাল কাটার প্রয়োজন হল। ফরাসিরা ভার নিল, লোকজন পাঠাল। কিন্তু কাজ হবে কি, যে যায় বিছানা নেয়, কাউকে ম্যালেরিয়া ধরে, কাউকে ধরে পীতজ্বরে। কুড়ি হাজার লোকক্ষয়ের পর ফরাসিরা ফিরে এল। কিন্তু ওই খাল কাটায় যুক্তরাজ্যের গরজ খুব বেশি ছিল। প্রয়োজনের সময় নৌবহর দেশের পুব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যাবার জো নেই। নিয়ে যেতে হলে হয় উত্তর আমেরিকার উত্তর দিয়ে, না হয় দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে তো কোনও কাজের কথা নয়। পানামার কাছের জায়গাটা খুব সরু হয়ে এসেছে, সেখানে একটা খাল কাটতে পারলে জাহাজ সহজেই সেই খাল দিয়ে দেশের এধার-ওধার যাতায়াত করতে পারবে।

ফরাসিরা চলে যাবার পর যুক্তরাজ্য ওই খাল কাটার ভার নিল। কিন্তু ফরাসিদের দশা দেখে যুক্তরাজ্য সরকার বিজ্ঞ হয়েছে। তারা সবপ্রথম এঞ্জিনিয়ার না পাঠিয়ে পাঠাল ডাক্তার।

ডাক্তারেরা আগে সেই স্থানে বড় বড় রাস্তা করল, জল নিকাশের জন্য ভাল ভাল ড্রেন তৈরি করল, খানা ডোবা সব ভরাট করল, বড় বড় বাড়ি তুলল, মশা মাছি তাড়াল। তখন এঞ্জিনিয়াররা গেল, খাল কাটা হল। অনেক আগে পাস্তুর যে পথ খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরবার পর পানামা খাল কাটা সম্ভব হল। তাই তো বলা হয়, পাস্তুর পানামা খাল কাটলেন।

কিন্তু পাস্তুর শুধুই কি পানামা খাল কাটলেন। আজ পৃথিবীতে যেখানেই একটি হাসপাতাল খোলা হচ্ছে সেখানেই তো পাস্তুরের বিধান অনুসারে কাজ চলছে। আর কেবল কি হাসপাতালে!

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের এক জায়গায় আছে—

'দলের মধ্যে নন্দ সকল প্রকার খেলায় ও ব্যায়ামে দলের সেরা ছিল। সেই নন্দর পায়ে কয়েকদিন হইল একটি বাটালি পড়িয়া গিয়া ক্ষত হওয়ায় সে খেলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। আজ প্রভাতেই বিনয়কে সঙ্গে করিয়া গোরা ছুতার পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

'নন্দদের দোতলার খোলার ঘরের দ্বারের কাছে আসিতেই ভিতর হইতেই মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা গেল। নন্দর বাবা বা অন্য পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই। পাশে একটি তামাকের দোকান ছিল তাহার কর্তা আসিয়া কহিল, নন্দ আজ ভোরের বেলায় মারা পড়িয়াছে, তাহাকে দাহ করিতে লইয়া গিয়াছে।

'নন্দ মারা গিয়াছে! এমন স্বাস্থ্য, এমন শক্তি, এমন তেজ, এমন হৃদয়, এত অল্প বয়স— সেই নন্দ আজ ভোর বেলায় মারা

৩

গিয়াছে। কী করিয়া মৃত্যু হইল খবর লইতে গিয়া শোনা গেল যে, তাহার ধনুষ্টংকার হইয়াছিল।'

এটা উপন্যাসের কথা হলেও এ রকম ঘটনা তো আগে অনেক ঘটেছে। কিন্তু আজ তো এ রকম বড় একটা হয় না। আজ প্রতি গৃহস্থ জানে যে, শরীরের কোন স্থান কেটে গেলে সেই জায়গাটা ধুয়ে ফেলে সেখানে টিঞ্চার আয়োডিন দিতে হবে, বেশি কাটলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে টিটেনস-বিরোধী সিরমের ইন্‌জেক্‌সন্ দিইয়ে নিতে হবে। অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পেতে গৃহস্থ এই যে ব্যবস্থা করছে তার মূলে তো রইল পাস্তরের দান।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আর-একটা ব্যাধি আছে যার নাম কালাজ্বর, তবে আজকাল ওই রোগ অনেক কমে গিয়েছে। যে সকল বিজ্ঞানীর আবিষ্ক্রিয়ার ফলে কালাজ্বর কমে গেল তাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় একজন বাঙালি বিজ্ঞানীর।

কালাজ্বর কতক বিষয়ে ম্যালেরিয়ার মতো হলেও ম্যালেরিয়া থেকে এ একেবারে স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষে আসাম ও বাঙলাদেশে এর আক্রমণ ছিল খুব প্রবল, আর এর মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৯৫। কালাজ্বরে ধরলে আর রক্ষে নেই এই ছিল লোকের ধারণা। আন্দাজে চিকিৎসা চলত, ফল কিছুই হত না, রোগ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিজ্ঞানী এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করলেন। লিশ্‌ম্যান ও ডনোভান প্রথমে ওই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাদের নাম অনুসারে ওই জীবাণুকে লিশ্‌ম্যান-ডনোভান বডি বলা হয়। এরা প্রোটোজোয়া শ্রেণীর জীবাণু। প্রোটোজোয়ার

বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এক বিভাগে আছে ম্যালেরিয়া আর এক বিভাগে কালাজ্বর। ম্যালেরিয়া-জীবাণুকে বহন করে নিয়ে যায় অ্যানোফিলিস, কিন্তু এই কালাজ্বর জীবাণুর বাহক কে? অনুসন্ধান চলল। কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের নেপিয়ার, নোলস, স্মিথ দেখালেন যে, স্যাণ্ডফ্লাই বলে এক রকমের ছোট মাছি রোগীর দেহ থেকে সুস্থ লোকের দেহে ওই জীবাণু বহন করে নিয়ে যায়। সাদা সাদা উন্‌কি পোকা হল এই স্যাণ্ডফ্লাই। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান চলছে।

এখানে একটা কথা আছে। মানুষের কালাজ্বর রোধ করবার সহজাত শক্তি খুব প্রবল। স্যাণ্ডফ্লাই একজন কালাজ্বর-রোগীকে কামড়ে একজন সুস্থ লোককে কামড়ালো; তখনই ওই সুস্থ লোকের কালাজ্বর দেখা দেবে না। জীবাণু সুস্থ লোকের শরীরে অনেক দিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল, ওত পেতে থাকল কখন ওই লোকের শরীর খারাপ হবে, তখন আক্রমণ চালাবে। এমন কি, কয়েক বছর ধরে তারা চুপ করে থাকবে, তারপর একদিন সেই লোকের ম্যালেরিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোনো রোগে যেই শরীর খারাপ হল, রোধশক্তি কমে এল, অমনি ওই জীবাণু তার আক্রমণ শুরু করল।

এখন এই জীবাণুকে কি করে ধ্বংস করা যায়। রজার্স অ্যান্টিমনি ইন্‌জেক্‌সন আরম্ভ করলেন, বিভিন্ন অ্যান্টিমনি লবণ ব্যবহৃত হতে থাকল। বোঝা গেল অ্যান্টিমনি এর ঠিক ওষুধ বটে, কিন্তু অ্যান্টিমনি ঘটিত যে সকল ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছিল, দেখা গেল অনেক রোগী তা সহ্য করতে পারে না, অন্য নতুন

উপসর্গ দেখা দেয়, অনেক সময় চিকিৎসা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ইউরিয়াস্টিবামিন নামে অ্যান্টিমনির এক যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন। এ ব্যবহারে আর কোন ভয় রইল না। পৃথিবীর চিকিৎসকেরা একে কালাজ্বরের এক অব্যর্থ ওষুধ রূপে নিয়ে নিল।

ব্রহ্মচারীর এই আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে কালাজ্বর রোগ চলে যাবার মতো হয়েছে।

প্লেগ পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক মৃত্যু ঘটিয়েছে। ১৮৯৬ সালে ভারতবর্ষে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। একটা হিসেবে জানা যায় যে, ১৮৯৮ সালের মধ্যে শুধু ভারতবর্ষে এক কোটি লোক প্লেগে মারা যায়। পাস্তুরের একজন শিষ্য ও জাপানের একজন বিজ্ঞানী প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাঁদের নাম ইয়ারসাঁ ও কিটাসাটো। দেখা গেল এই জীবাণুর বাহক হল ইঁদুরের গায়ের পোকা। এই পোকা যখন প্লেগ রোগীকে কামড়ে ইঁদুরকে কামড়ায়, ইঁদুরের প্লেগ হয়, ইঁদুর মারা যায়। ইঁদুরের গায়ের পোকা তখন ইঁদুরের গা থেকে গিয়ে মানুষকে কামড়ায়, মানুষের প্লেগ হয়। তাহলে মাঝে রইল ইঁদুর আর ইঁদুরের গায়ের পোকা। এই পোকা নির্মূল করতে পারলে ইঁদুরও বাঁচে মানুষও বাঁচে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। বাকি রইল ইঁদুর। এরা ভারি চালাক, সহজে ধরা দেয় না, আর এদের বংশবৃদ্ধিও খুব বেশি। যতটা পারা যায় এদের বধ করতে হবে।

হাফকিন ছিলেন রাশিয়ার অধিবাসী। তিনি পাস্তুরের ছাত্র হন, তারপর ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৮৯৬ সালে তিনি প্লেগের টিকা আবিষ্কার করেন।

প্লেগ কল্‌কাতায় আবার দেখা দিয়েছে। একে আটকাতে হলে আমাদের টিকা নিয়েথাকতে হবে আর ইঁদুরকে ধ্বংস করতে হবে। ইঁদুরের পোকা মারতে ডি. ডি. টি. বেশ কাজ করে। পোকারা বেশি উপরে লাফিয়ে উঠতে পারে না, সাধারণত পায়ে কামড়ায়। সেজন্য মোজা পরে থাকা ভাল।

জীবাণুর আকৃতি

একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর অনুচরদের ডেকে বলেছিলেন, নিজেদের চেয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে ভাল করে চিনে রেখো, যুদ্ধজয়ের অর্ধেক সেখানেই। যে চিকিৎসক ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে চলেছেন, তাঁকে এই কথাটা ভাল করে মনে রাখতে হবে। মানুষের সকল শত্রুর বড় শত্রু হল ওই সব জীবাণু, তারা চোখের আড়ালে থাকে, অনেক তোড়জোড় করে তাদের খুঁজে বের করতে হয়, তাদের রীতিনীতির পরিচয় পেতে হয়, তাদের ধ্বংসের উপায় ঠিক করতে হয়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সব জীবাণুই যে মানুষের শত্রু তা নয়, মিত্র জীবাণুও আছে। দুধকে দই করে এক রকমের মিত্র জীবাণু।

বিজ্ঞানী বিভিন্ন জীবাণুর সন্ধানে চললেন। প্রতি পদে নতুন নতুন বাধা আসতে থাকল, আর বিজ্ঞানী সেগুলি কাটিয়ে কাটিয়ে

এগোতে থাকলেন। জীবাণুদের কোন রং নেই, সেজন্য অণুবীক্ষণে তাদের টের পাওয়া কঠিন। দেখা গেল, এক-এক শ্রেণীর জীবাণু এক-এক রং পছন্দ করে। যে যা রং ভালবাসে, তাই দিয়ে তাকে রঙিয়ে দেওয়া হল। অবশ্য কতক শ্রেণীর জীবাণু একেবারে কোন রংই নিতে চায় না। তাদের উপর জবরদস্তি চালাতে হল। দেখা গেল, আস্তে আস্তে গরম করলে তারাও নির্দিষ্ট রকমের রং নেয়।

জীবাণুরা আকারে কত বড় ? মাপজোখ হল। কিন্তু খালি চোখে যাদের দেখা যায় না, ইঞ্চি সেন্টিমিটার দিয়ে তো তাদের মাপ চলে না। এক নতুন মাপকাঠি ঠিক করা হল। এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগকে একক ধরা হল, তার নাম দেওয়া হল মাইক্রন। দেখা গেল, একটি সাধারণ জীবাণুর ব্যাস এক দুই তিন বা তার কিছু বেশি মাইক্রন, কারও কারও ব্যাস একেরও কম। অন্য দিকে এক শ বা তার বেশি মাইক্রন ব্যাসের জীবাণুও দেখা গেল।

জীবাণুদের আকৃতিও বিভিন্ন। মোটামুটি তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর জীবাণুর আকৃতি গোল। বেশির ভাগ জীবাণু এই শ্রেণীতে পড়ে। এরা আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে। কেউ কেউ একা একা থাকে। এদের শুধু ককাই বলা হয়। নিউমোনিয়া মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগের জীবাণু সব সময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এদের বলা হয়, ডিপ্লোককাই। আবার আঙুরের থোলোর মতো দল বেঁধে কতকগুলি থাকে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্যাফিলককাই।

মুক্তামালার মুক্তার মতো কারও কারও অবস্থিতি, এদের নাম স্ট্রেপ্টোককাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবাণু দেখতে সরু সরু কাঠির মতো। টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের জীবাণুগুলি এই রকমের। এরা দল বেঁধে থাকে। এদের ব্যাসিলি বলা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর জীবাণুরা পেঁচালো ধরণের, স্ক্রুপের প্যাঁচের মতো পাক খেয়ে থাকে। এদের স্পাইরিলি বলা হয়। মোটামুটি এই তিনটি শ্রেণী থাকলেও দুই শ্রেণীর মিশানো জীবাণুও দেখা যায়।

সাধারণত একটা জীবাণু ভেঙে দুটো হয়, আর এ রকম ভাঙতে ভাঙতে অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। এমনও দেখা গিয়েছে যে, অনুকূল অবস্থায় একটা জীবাণু ভেঙে ভেঙে চব্বিশ ঘণ্টায় এক কোটি সত্তর লক্ষ জীবাণুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করতে থাকলেন, কিসের মধ্যে এই বৃদ্ধি বেশি হয়, কিসের মধ্যেই বা কমে, আর কি করে তাদের বিনাশ করা যায়।

মানবের অদৃশ্য শত্রুর তালিকা এখানেই শেষ হল না। যাদের কথা বলা হল, তাদের চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তারা অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে। কিন্তু ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণেও ধরা পড়ে না, এমন জীবাণুরও কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া গেল। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, কর্ণমূল প্রভৃতি রোগ এই শ্রেণীর জীবাণুর জন্য ঘটে। এদের বলা হয় ভাইরস। সম্প্রতি বিজ্ঞান যে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ তৈরি করেছে তার সাহায্যে ভাইরসও ধরা পড়ছে। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে একটি ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ

বসানর কাজ শেষ হল। ভারতবর্ষে আর কোথাও ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ নেই।

ভাইরস যে কত ছোট, একটা হিসেব থেকে দেখা যাবে। সবচেয়ে ছোট যে ভাইরস, তার ব্যাস এক মাইক্রনের লক্ষ ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম। যে বিশেষ ছাঁকনি দিয়ে সাধারণ জীবাণুকে পৃথক করা যায়, এই ভাইরস তাতে আটক পড়ে না, তার ভিতর দিয়ে চলে যায়। অথচ এরাই মানুষের এত বড় শত্রু! জীবের সংস্পর্শে এলে তবে এরা বাড়ে; এদের চাষ করতে হলে জড়ের উপর করলে চলবে না। আমরা ভাইরসকে জীবাণু বললুম। সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে, এরা জড় না জীব। এদের একদল দানা বাঁধতে পারে, তাই থেকে সন্দেহ জেগেছে। জীবতত্ত্ববিদ্ অবাক হচ্ছেন, ভাইরস যদি জীবাণু হয়, তবে তারা দানা বাঁধে কি করে। আবার রসায়নবিদ্ গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এরা যদি অণু হয়, তবে এরা ভাঙছে কি করে।

এ প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা আজও হয় নি, কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, ভাইরস জড় ও জীবের মধ্যে এক সেতু। সেতুর জড়ের দিকে রইল তামাকের ব্যাধির ভাইরস আর জীবের দিকে টাইফস রোগের ভাইরস। ভাইরস জড় না জীব, এ প্রশ্ন যিনি করছেন, তাঁকে উল্টো প্রশ্ন করা যায়, জীব ঠিক কাকে বলে? আজও বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের কথা স্মরণ করছে, প্রকৃতিতে জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে, কোথাও একটা পরিষ্কার রেখা টেনে দুটোকে ভাগ করা চলে না।

তিন-চার দিনের বাসি রুটি, কাটা আলু, ফল প্রভৃতিতে ছাতা পড়তে দেখা যায়। যারা এই রকম ঘটায়, তাদের শ্রেণীর কয়েকটি দল মানুষের শরীরে বিশিষ্ট রকমের রোগ জন্মায়। গায়ের চামড়ার উপর দাদ চুলকনা প্রভৃতি রোগ এই শ্রেণীর জীবাণুর জন্যে হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কয়েকটি দল আছে, যারা মানুষের শত্রু তো নয়ই, পরম মিত্র। এদের কথা পরে আলোচনা করা হবে।

প্রোটোজোয়া শ্রেণীর জীবাণু মানুষের আর এক শত্রু।

প্রোটোজোয়াদের একদল ম্যালেরিয়ার কারণ, আর একদল কালাজ্বর ঘটায়, অন্য একদলের জন্য আম রোগ হয়।

এরা তো হল মানুষের অদৃশ্য শত্রু। কিন্তু বড় বড় কীটও মানুষের রোগ ঘটায়, যেমন ক্রিমি, উকুন প্রভৃতি।

অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম

মানুষের দেহে জীবাণু আসে মানুষ থেকে, অন্য প্রাণী থেকে। মানুষ থেকেই বেশি আসে। মানুষই মানুষের বড় শত্রু।

রোগ ঘটাতে হলে সবপ্রথম জীবাণুকে মানুষের দেহে আড্ডা গাড়তে হবে। আর শুধু আস্তানা পেলে হবে না, আশপাশের অবস্থা এমন হওয়া চাই, যাতে সে হু হু করে বেড়ে যেতে পারে। জীবাণুর শক্তি তো তার সংখ্যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের শরীর গোড়া থেকে হার স্বীকার করে চুপচাপ থাকে না, সেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যে জীবাণু আসবে, প্রথমত, তাকে বেশ জোরালো হতে হবে, তারপর তাকে বেশ দল ভারি করে

আসতে হবে, তবেই তার জয়ের সম্ভাবনা থাকবে। অন্য দিকে মানবদেহের ত্বক আর দেহের ভিতরকার শ্লেষ্মঝিল্লি আত্মরক্ষার প্রথম সারিতে অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। আগন্তুক জীবাণু যদি বেশি জোরালো না হয়, তবে এই প্রথম বাধাতেই তার বিনাশ। জীবাণু কোন্ পথ দিয়ে শরীরে ঢুকছে, সেও একটা বড় কথা। ত্বকের উপর না এসে সে যদি সোজাসুজি রক্তের মধ্যে ঢুকতে পারে, তবে তার অনিষ্ট করবার শক্তি খুব বেশি হবে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ত্বকের সামান্য আঁচড়ে যদি স্ট্রেপ্টোককস জীবাণু এসে পৌছয়, তবে সেখানে বড়জোর একটা ফোঁড়া হবে। কিন্তু এই স্ট্রেপ্টোককস জীবাণু যদি একেবারে সোজাসুজি রক্তস্রোতের মধ্যে পৌছতে পারে, তবে মারাত্মক সেপ্টিসিমিয়া রোগ জন্মায়। প্রসবের পর অনেক রমণী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো।

সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে বিভিন্ন জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। যক্ষ্মার জীবাণু নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়ে যায়, কলেরা টাইফয়েড আম রোগের জীবাণু খাওয়ার মধ্য দিয়ে ঢোকে, আর মশা চামড়া ভেদ করে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়।

যে জীবাণু মানবদেহে এসে জেঁকে বসল, সে নানা রকমে দেহকে আক্রমণ করতে থাকে। দেহতন্তুকে, রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে; আবার এমন সব বিষ প্রস্তুত করে যা দেহতন্তুকে ক্ষয় করে যায়।

অন্যদিকে মানবদেহও বেশ সজাগ আছে। বাইরে থেকে জীবাণু যেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করল, অমনি রক্তের শ্বেতকণিকা

তাদের দিকে ছুটে গেল, যুদ্ধ আরম্ভ হল। অণুবীক্ষণ দিয়ে এ-যুদ্ধের পদ্ধতি ভাল রকম দেখা যায়। শ্বেতকণিকা জীবাণুর দিকে ছুটে এল, তাকে গ্রাস করল, ধ্বংস করল। আর একটা মজার ব্যাপার আছে। জীবাণু এসে যে বিষ তৈরি করল, রক্তের মধ্যে তার প্রতিষেধক বিষেরও সৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। কথক-ঠাকুরের মুখে শোনা গিয়েছিল, রাবণ যেই অগ্নিবাণ ছোঁড়েন, অমনি রামচন্দ্র বরুণবাণ ছুঁড়ে আগুন নেবান। এখানকার যুদ্ধও অনেকটা সেই রকমের।

বিজ্ঞানীর আসবার অনেকদিন আগে থেকেই তো মানুষ পৃথিবীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে আসছে। চারদিকে তো অসংখ্য জীবাণু ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে কি করে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। কথাটা হল এই। সাধারণত প্রত্যেক মানুষের বাহিরের জীবাণুকে বাধা দেবার একটা সহজাত শক্তি থাকে। সুস্থ সবল অবস্থায় সে অধিকাংশ জীবাণুর আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। একটা চলতি কথা আছে, শক্ত মাটি বেড়ালে আঁচড়াতে পারে না। তবে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, অত্যধিক পরিশ্রমে যখন তার এই রোধশক্তি কমে আসে, তখন বাইরে থেকে জীবাণু এসে তার দেহের মধ্যে জেঁকে বসে হু-হু করে বেড়ে যায়, আক্রমণ চালায়। তাছাড়া সকলের মধ্যে সকল রকম জীবাণুর বাধা দেবার শক্তি থাকে না। বয়সেরও একটা কথা আছে। হাম ডিপথেরিয়া হুপিং-কাশি শিশুদেরই বেশি ধরে, আবার বেশি বয়সে রোধশক্তি কমে যাওয়ার ফলে নিউমোনিয়া ও অন্যান্য রোগ বৃদ্ধদেরই বেশি হয়। অন্যদিকে

দেখা যায়, এক-এক শ্রেণীর প্রাণীর এক-এক রকমের জীবাণু রোধ করার ক্ষমতা খুবই প্রবল। ইঁদুরের ডিপথেরিয়া হয় না, কুকুর ভেড়া ছাগল ঘোড়ার যক্ষ্মা হয় না, পায়রার নিউমোনিয়া হয় না, কুমীর-গিরগিটির ধনুষ্টংকার হয় না। মানুষের মধ্যে দেখা যায়, যক্ষ্মা রোগ বাধা দেবার শক্তি ইহুদীদের খুব বেশি, কাফ্রীদের খুব কম।

বিজ্ঞান বাইরে থেকে মানবের এই বাধা দেবার শক্তি বাড়াবার নানারকম ব্যবস্থা করতে থাকল। টিকা বা ভ্যাকসিন ও সিরাম আবিষ্কৃত হল। ভ্যাকসিন ও সিরাম কি, আর মোটামুটিভাবে ওরা দেহে গিয়ে কি করে দেখা যাক। নির্দিষ্ট রোগের কতকগুলি জীবাণু নিয়ে তাদের উপযুক্ত খাবার দিয়ে তাদের সংখ্যা বাড়ান হল, অর্থাৎ সেই জীবাণুদের চাষ করা হল। এখানে দেখা যায়, অধিকাংশ জীবাণুকে অল্প একটু গরমে রাখলে, মানুষের দেহের যে উষ্ণতা মোটামুটি সেই উষ্ণতায় রাখলে, তারা ফুর্তিতে বেড়ে যায়। তখন তাদের কতকগুলিকে নিয়ে নরমাল লবণ জলে রেখে একটু বেশি গরম করা হল, মোটামুটি ৬০ ডিগ্রি উত্তাপে তারা মরে যাবে। না পচে সেজন্য কয়েক ফোঁটা ফিনাইল বা ওই রকম রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া হল।

এখানে একটা কথা আছে। জীবাণুরা মরে গেল বলা হল, কিন্তু জীবাণুদের দেহের কাঠামো ঠিক রইল। সেগুলি রক্তের মধ্যে গিয়ে সেই জাতীয় জীবাণুর প্রতিষেধক বস্তু তৈরি করতে শ্বেতকণিকাকে উত্তেজিত করল। কলেরা প্লেগ টাইফয়েড প্রভৃতির টিকা এই রকমে তৈরি করা হয়। এই হল ওই জীবাণুর

টিকা বা ভ্যাকসিন। উত্তেজনার ফলে শ্বেতকণিকার শক্তি বেড়ে গেল, পরে বাইরে থেকে যখন বলবান শত্রু আসবে, সে তাকে ঠেকাতে পারবে। টিকার একটা মাত্রা ঠিক করে নিতে হয়। টিকা যদি না দেওয়া থাকত, প্রথম থেকে যদি প্রবল শত্রু আসত, তবে শ্বেতকণিকা নিজেকে অক্ষম জেনে কোন চেষ্টাই করত না। আগে একবার রোগ হয়ে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তের শ্বেতকণিকারা প্রস্তুত হয়েই থাকে, তখন দ্বিতীয়বার সেই রোগ আর ধরে না। বসন্ত ডিপথেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি এই রকমের রোগ। তাই জেনারকে গয়লানী যে কথা বলেছিল—আমার একবার বসন্ত হয়েছে, আর হবে না, দেখা যায়, সে কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। বসন্তের টিকা কিন্তু জ্যান্ত জীবাণু, গোরু থেকে নেওয়ায় শক্তি খুব মৃদু হয়ে গিয়েছে।

সিরাম বাইরে থেকে প্রতিরোধক বস্তু নিয়ে চলল ; এখানে দেহের রক্তকণিকাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না, যা করবার ওই সিরামই করবে। সিরাম তৈরি করা হয় এই রকমে। ঘোড়ার দেহে বিশিষ্ট জীবাণু অল্প পরিমাণে ইন্‌জেক্‌সন করে দেওয়া হল, মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া হতে থাকল, রক্তে প্রতিরোধক বস্তু তৈরি হয়ে চলল। যে মাত্রা গোড়ায় দিলে ঘোড়া মরে যেত, সে মাত্রা যখন অনেক গুণ ছাড়িয়ে গেল, অথচ দেখা গেল, ঘোড়া বেশ সুস্থ সবল রইল, তখন বোঝা গেল, ঘোড়ার রক্তে অত্যধিক পরিমাণে প্রতিরোধক বস্তু তৈরি হয়েছে।

এখন ঘোড়ার শরীর থেকে রক্ত বের করে নিয়ে তার থেকে রক্ত-রস পৃথক করা হল, এই হল সিরাম। এখন একে জীবাণুশূন্য

কাচের পাত্রের মধ্যে পুরে একেবারে বন্ধ করে রাখা হল। একজন লোকের যখন ওই রোগ দেখা দিল, সেই সিরাম ইন্‌জেক্‌সন করে দেওয়া হল, তৈরি প্রতিরোধক বস্তু বাইরে থেকে এসে যুঝতে থাকল। সিরামের কাজ হবে শিগ্‌গির শিগ্‌গির, তবে ওর ক্ষমতাও শিগ্‌গির ফুরিয়ে যাবে, তাই বারে বারে সিরাম দিয়ে যেতে হবে। যে রোগের জীবাণু দেহের ভিতর গিয়ে অনবরত বিষ ছড়াতে থাকবে, তাদের দমন করতে সিরাম ব্যবহার করতে হবে। ডিপথেরিয়া ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগে সিরামই দিতে হয়।

জীবাণুর আর এক শত্রু হল ফাজ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে জীবাণু, তার তুলনায়ও এই ফাজ অতি ক্ষুদ্র। ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ দিয়েও একে দেখা যায় না, ফিল্টারে একে পৃথক করা যায় না। একে সহজে বিনাশ করা যায় না, আর এর ক্ষমতা অনেকদিন পর্যন্ত থাকে। এরা পাশের জীবাণুকে দমন করে। দেহের অন্ত্রের মধ্যে যে ফাজ জন্মায়, কলেরা আম রোগের জীবাণু এলে এই ফাজ তাদের বাড়তে দেয় না, রোগ সেরে যায়। যে অন্ত্রে ফাজ নেই, সেখানে বাইরে থেকে এনে দিলে সুফল পাওয়া যায়। এক জাতের জীবাণুকে সেই জাতেরই ফাজ খেয়ে ফেলে।

দেখা যায়, গঙ্গার জলের, অনেক পুকুরের জলের কলেরা প্রভৃতি জীবাণু রোধ করবার ক্ষমতা আছে। বিজ্ঞানী মনে করেন, ফাজ থাকার জন্য ওই সব জলের ওই ক্ষমতা। তবে ফাজ সম্বন্ধে এখনও বিজ্ঞানীকে অনেক পরীক্ষা করতে হবে, তবেই তিনি একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন।

দু রকম অদৃশ্য শত্রুর পরিচয় পাওয়া গেছে— ব্যাকটিরিয়া

আর প্রোটোজোয়া। দেখা গেল, ভ্যাকসিন সিরাম ফাজ প্রভৃতি দিয়ে ব্যাকটিরিয়া-জীবাণুদের দমন করা যায়, কিন্তু প্রোটোজোয়া-জীবাণুদের বেলায় ভাবতে হল বিভিন্ন রাসায়নিক বিষদ্রব্য যা ওই জীবাণুকে মারবে অথচ যা মানুষের কোন ক্ষতি করবে না। অনুসন্ধান চলল। ম্যালেরিয়ার জন্য বেরল কুইনিন মেপাক্রিন প্যালুড্রিন ইত্যাদি, অ্যামিবা আম রোগের জন্য এমেটিন, স্টোভারসল, কারবারসন প্রভৃতি, আর কালাজ্বরের জন্য ইউরিয়া-স্টিবামিন। এই প্রোটোজোয়া শ্রেণীর জীবাণুকে টিকা দিয়ে দমন করা যায় কি না এখন বিজ্ঞানী সেই চিন্তা করছেন।

কীটপতঙ্গজাতীয় দৃশ্য শত্রুকে মারতে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হল, ডি. ডি. টি. তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান এসব ব্যাপারে কি পেরেছে বলা হল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কি পারে নি, তা বলতে হয়।

ফাইলেরিয়া জীবাণুজনিত রোগ এটা জানা গিয়েছে, কিন্তু ওই জীবাণুকে বধ করার কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কুষ্ঠ রোগের জীবাণু দেখা গিয়েছে, কিন্তু ওই জীবাণুকে চাষ করার কোন উপায় আজও বেরল না, সুতরাং টিকা দিয়ে ওর হাত এড়ানোর কোন ব্যবস্থা হল না। পৃথিবীর একটা বড় ব্যাধি হল যক্ষ্মা। এই রোগ বেড়েই চলেছে। এর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু রোগের আক্রমণ রোধ করা যায় কি করে? সম্প্রতি এর যে টিকা বেরিয়েছে, সেই বি. সি. জি. টিকা দিয়ে নরওয়ে সুইডেনে পঁচিশ বছরে মৃত্যুহার ১৬ থেকে ১-এ নেমেছে।

বি. সি. জি. টিকার আবিষ্কার এই রকম। যক্ষ্মার জীবাণু যখন পাওয়া গেল তখন সেই জীবাণুর চাষ করে, তাদের মেরে ফেলে কলেরার টিকার মতো মরা জীবাণু দিয়ে টিকা তৈরি হল। কিন্তু এ টিকায় কোন ফল হল না। ফরাসি দেশে ক্যালমেট ও গ্যেরিন জ্যান্ত জীবাণুর টিকা তৈরি করতে লেগে গেলেন। গোরুর যক্ষ্মার জীবাণু নিয়ে বিশেষ রকম খাদ্যে ওই জীবাণুর চাষ করে যেতে থাকলেন। প্রতিবারে ওর শক্তি মৃদু হতে লাগল। দু শ বারের বেশি এই রকম প্রক্রিয়ার পর জীবাণুর শক্তি অত্যন্ত মৃদু হয়ে এল, তখন ওই টিকা ব্যবহারের উপযোগী হল। কিন্তু একটা কথা রইল। যাকে তাকে এই টিকা দিয়ে গেলে চলবে না।

এ সম্বন্ধে একটা কথা আছে যা শুনলে আমাদের স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। পরীক্ষায় জানা যায় আমাদের মধ্যে শতকরা প্রায় আশি জন লোকের কোন না কোন সময়ে যক্ষ্মা হয়েছে, আবার সেরেও গেছে, হওয়াও আমরা টের পাই নি, যাওয়াও জানতে পারি নি। জীবাণু এসেছে, আর দেহের রোধশক্তি তাকে হঠিয়েছে। এখন যে লোকের শরীরে এই রোধশক্তি আছে, তাকে ওই টিকা দেওয়া চলবে না। পরীক্ষায় দেখতে হবে রোধশক্তি আছে কি না, আর এর জন্য বিশেষ পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছে।

টিকা তৈরি কথাটায় আসা যাক। এখানে জ্যান্ত জীবাণু নিয়ে কারবার, আর নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোন সময় মৃদু জীবাণুর মধ্যে যদি তীব্র জীবাণু এসে যায়, তবে সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একবার এই রকম হয়েও

ছিল। তখন টিকা মুখ দিয়ে খাওয়ানো হত। ১৯৩০ সালে জার্মানির লিউবেক শহরে ২৫০টি শিশুকে এই ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয়। কয়েক মাসের ভিতর ওদের মধ্যে ৭২টি শিশু যক্ষ্মায় মারা গেল। ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়াল। অনুসন্ধানে দেখা গেল পরীক্ষাগারে কর্মীদের অসাবধানতায় মৃদু জীবাণুর মধ্যে তীব্র জীবাণু চলে গিয়েছিল। এখন সরকারি ব্যবস্থায় টিকা তৈরি হয় আর এ সম্বন্ধে বিশেষ নজর রাখা হয়।

আবিষ্কারকদের নাম অনুসারে এই টিকাকে বি. সি. জি. ভ্যাকসিন বলা হয়। বি. সি. জি. অর্থাৎ ব্যাসিলস ক্যালমেট গ্যেরিন।

এই টিকার ব্যবহার ভারতবর্ষে সবে আরম্ভ হল।

কতকগুলি রোগ আছে, বাইরের কোন শত্রু যাদের ঘটায় না— যেমন ক্যানসার। দেহতন্ত্বর এমন একটা পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ওই রোগ হয়; কিন্তু পরিবর্তনটা ঠিক কি জানা নেই। রেডিয়ম, সাপের বিষ দিয়ে ক্যানসার চিকিৎসা চলছে, কিছু কিছু ফলও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু চিকিৎসাটা এখনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায় নি।

মানুষের দেহে নিয়তই ভাঙাগড়া চলেছে। সেই প্রক্রিয়ার এদিক-ওদিক হওয়ার জন্য অনেক ব্যাধি দেখা দেয়, যেমন বহুমূত্র, রেনাল কলিক, রক্তের চাপ, সহজ রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রমজনিত রোগ, হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ, হাঁপানি প্রভৃতি শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ, নার্ভ ঠিকমতো কাজ না করার জন্য রোগ, ভাইটামিনের অভাব জনিত রোগ ইত্যাদি। জীবাণুর জন্য এসব রোগ ঘটে না।

সীসা, তামা, অভ্র প্রভৃতির কারখানায়, কয়লার খনিতে যারা কাজ করে, তাদের বিশেষ বিশেষ রকম রোগে ভুগতে দেখা যায়। এসবও জীবাণুজনিত রোগ নয়। জীবাণু ব্যতিরেকে ঘটে থাকে এরকম রোগ সারাতেও বিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়েছে। এইবার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্য-এক দিকে একটা কৃতিত্বের কথা বলা হচ্ছে।

মানুষের অদৃশ্য মিত্র

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধকালে রাজনীতিজ্ঞরা এই নীতি অবলম্বন করেন। দেখা গেল, রোগের সঙ্গে যুদ্ধেও এই নীতি অবলম্বন করা যায়।

ধরা যাক, নিউমোনিয়া রোগ। এক রকম বিশিষ্ট জীবাণু থেকে এই রোগ হয়। আচ্ছা, হরেক রকম জীবাণুর মধ্যে সন্ধান করা যাক, কে এই নিউমোনিয়ার শত্রু আছে। যদি থাকে, তবে তাকেই লাগিয়ে দেওয়া যাবে নিউমোনিয়া জীবাণুর বধকার্যে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই উপায় অবলম্বন করে আমরা সফলকাম হয়েছি, এখানে পারব না? কাঠে কাঠে লেগে যাক, আমরা মজা দেখি, অবশ্য দূরে দাঁড়িয়ে নয়, কারণ আমাদের দেহ হল এই যুদ্ধক্ষেত্র।

যে সকল স্ট্যাফিলককসের জন্য মানবদেহে চর্মরোগ ফোড়া প্রভৃতি জন্মায়, তাদের সম্বন্ধে সেণ্ট মেরি হাসপাতালে ফ্লেমিং অনুসন্ধান করছিলেন। একটা ফোড়া থেকে কিছু পুঁজ নিয়ে ফ্লেমিং একটা কাচের পাত্রের উপর রেখে দিলেন। জীবাণুদের

পুষ্টির জন্য আগার নামক জেলির উপর ওটা ছড়ান ছিল। জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়তে থাকল। এক-এক জায়গায় কিভাবে তারা জমায়েৎ হতে থাকে, ফ্লেমিং মাঝে মাঝে তা লক্ষ্য করছিলেন। পাত্রে নানা স্থানে তারা দলবদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু ফ্লেমিং দেখলেন, একটা জায়গায় একটা নীলাভ ছাতা পড়েছে। ওই জায়গাটা তত পরিষ্কার ছিল না, এই রকম তো মনে হবার কথা। কিন্তু ফ্লেমিং ওটাকে ফেলে না দিয়ে সরিয়ে রাখলেন, পরে দেখবেন ওখানে কি ঘটে। এখানেই রইল ভবিষ্যৎ কালের চিকিৎসাজগতের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। কেবলমাত্র কৌতূহল বশে ফ্লেমিং ওটাকে রেখে দিলেন। কিন্তু শেষ অবধি এই কৌতূহলই তাঁকে পুরস্কৃত করল।

ফ্লেমিং দেখলেন যে, যেখানে ওই ছাতা পড়েছে তার চারি-দিকের জীবাণুগুলি পাত্রের অন্য স্থানের জীবাণুর মতো সবল ও সতেজ নেই। মনে হয় যেন ওই ছাতা ওই জায়গার জীবাণু-গুলিকে ভাঙছে গলাচ্ছে। ফ্লেমিং চিন্তা করতে লাগলেন। তবে কি ওই ছত্রক বা ছত্রক হতে উৎপন্ন কোন দ্রব্য যে জীবাণু তার সংস্পর্শে আসছে, তাকে ধ্বংস করে ফেলছে। তা যদি হয়, তবে শুধু কি আগারপূর্ণ ওই পাত্রে এই রকম হবে, মানুষের দেহে কি এই রকম ঘটবে না ? ফ্লেমিংএর কাছে এ যেন একটা স্বপ্ন! তিনি একটা নতুন আলো দেখতে পেলেন। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চলতে থাকল। স্ট্যাফিলককসের বদলে এক এক করে অন্য শ্রেণীর জীবাণু আনা হতে থাকল, দেখা গেল কেউ স্ট্যাফিল-ককসের মতো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হল, কারও বাড় কমে গেল,

আবার অন্য দলের কিছুই হল না। দেখা গেল এই ছত্রক সব রকম জীবাণুর শত্রু নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর শত্রুকেও যদি নাশ করতে পারে, তবে তো ও মানবের এক অচিন্তনীয় পরম মিত্র।

এবার ছত্রক থেকে ওই মূল বস্তুকে বিশুদ্ধ আকারে পাবার চেষ্টা হল। এই কাজে ফ্লেমিংএর সঙ্গে রসায়নবিদেরাও যোগ দিলেন। শেষ অবধি ওকে বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া গেল। আর পেনিসিলিয়ম নোটেটম জাতীয় ছত্রক থেকে পাওয়া যাওয়ায় ফ্লেমিং ওর নাম দিলেন পেনিসিলিন।

১৯২৮ সালে সেণ্ট মেরি হাসপাতালে এই যে যুগান্তকারী আবিষ্কার হল, ঘটনাচক্রে তা আর বেশি দূর এগুলো না। এ নিয়ে লোকের বেশি মাথা না ঘামাবার কারণ এই, সে সময়ে জার্মানিতে প্রণ্টোসিল নামে এক নতুন ওষুধ বেরিয়েছে, আর এই প্রণ্টোসিলের রোগ সারাবার ক্ষমতা দেখে পৃথিবীর চিকিৎসকগণ স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এই প্রণ্টোসিল একটি রাসায়নিক দ্রব্য, পশমি কাপড় রং করতে যে অ্যানিলিন-জাতীয় রং ব্যবহার করা হয়, এ তার থেকে তৈরি। দেখা গেল, ককাই-জাতীয় জীবাণু ধ্বংস করতে এর ক্ষমতা অসাধারণ। আরো সুবিধার কথা এই যে, কয়েকটি সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে একে তৈরি করা যায়, সে জন্য দামেও খুব সস্তা। জার্মানির এই আবিষ্কারের পর ইংলণ্ডের রসায়নবিদ্‌গণ এবিষয়ে মন দিলেন, আর তাদের চেষ্টার ফলে সলফনামাইড নামে এই শ্রেণীর ওষুধে বাজার ছেয়ে গেল। এই কারণে পেনিসিলিনের কথা লোকে ভুলে গেল, তা ছাড়া ওর তৈরি খুব শ্রমসাধ্য ব্যাপার, আর দামও বেশি।
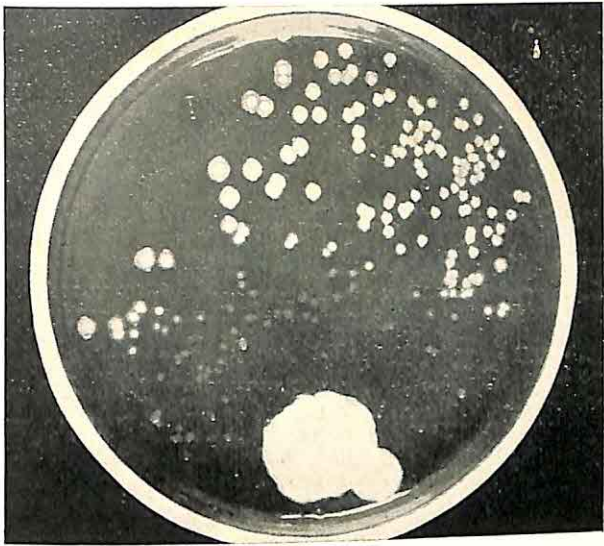
এই কাচের পাত্রে প্রথম পেনিসিলিন ধরা পড়ে
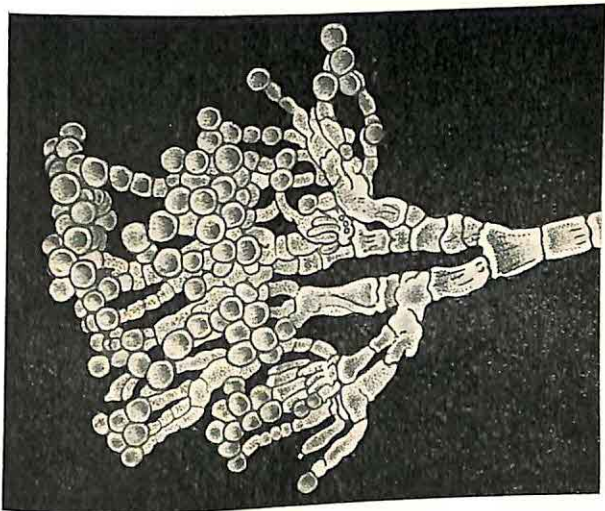
পেনিসিলিআম নোটেটাম নামক ছত্রক থেকে পেনিসিলিন পাওয়া যায়
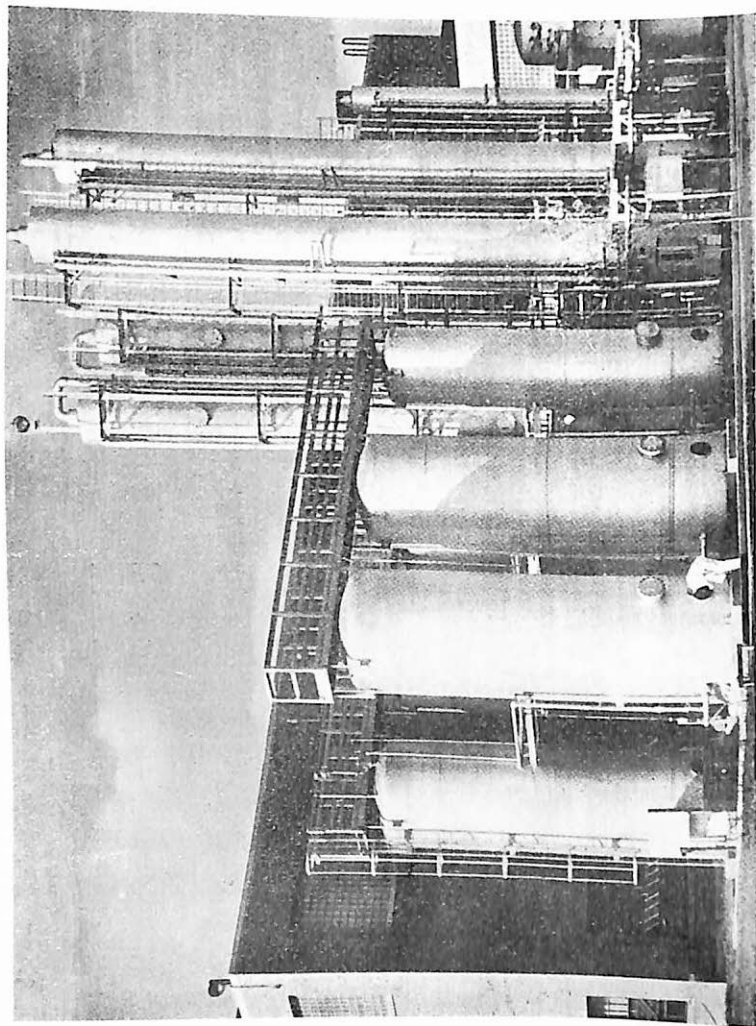
আমেরিকায় পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা

অ্যালেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

১৮৮১
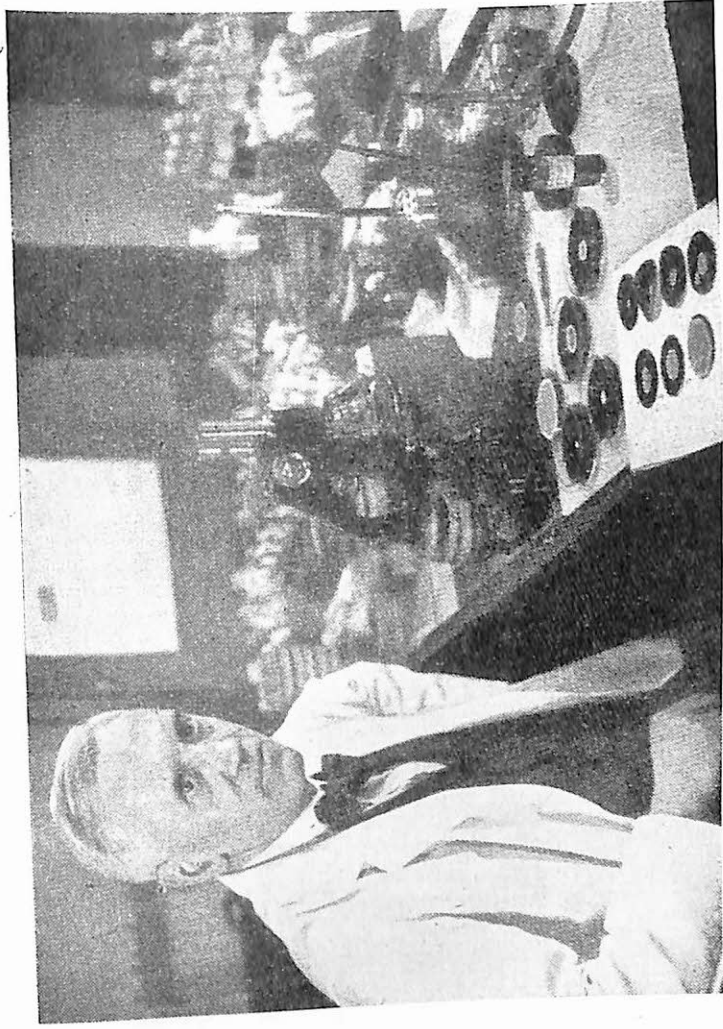
পেনিসিলিনের আবিষ্কারক
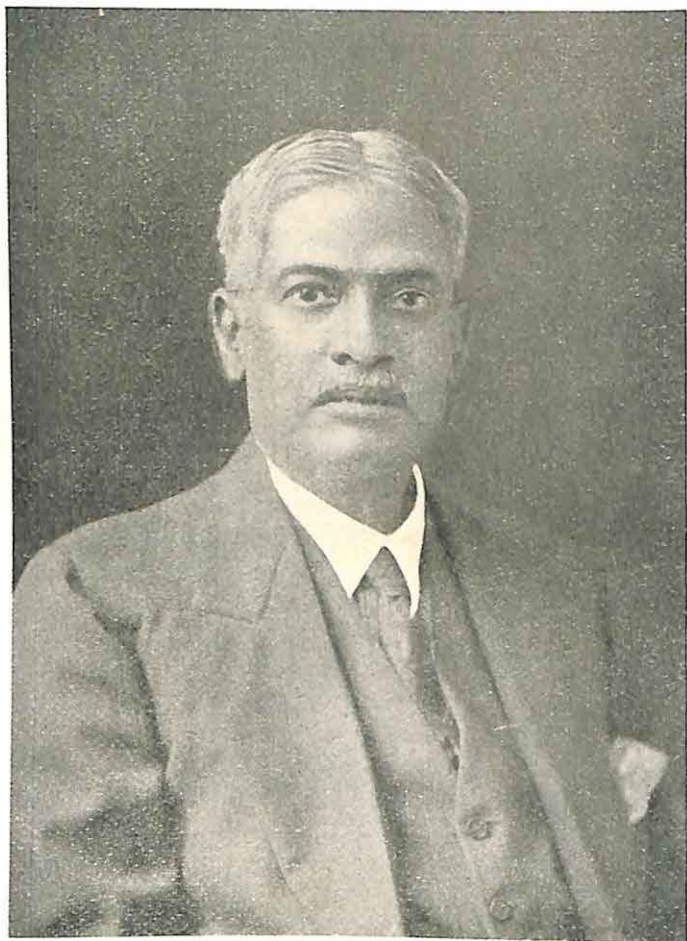
সার্ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

১৮৭৩ – ১৯৪৬

কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন

যা হোক দশ বছর পরে বিজ্ঞানীরা যুদ্ধের তাগিদে পেনিসিলিন সম্বন্ধে সজাগ হলেন।

একটা ব্যাপার দেখা গেল। পেনিসিলিন সোজাসুজি জীবাণুকে মেরে ফেলে না, এ-কাজ শেষ অবধি শ্বেতকণিকার উপর রয়ে গেল। শ্বেতকণিকারা পেরে উঠছিল না, কারণ জীবাণুরা দ্রুত বেড়ে গিয়ে দলে ভারি হচ্ছিল। এখন পেনিসিলিন ও শ্বেতকণিকা বন্ধুভাবে মিলল। পেনিসিলিন জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ করল, তাদের নিস্তেজ করল, তখন শ্বেতকণিকারা সহজেই তাদের ধ্বংস করল।

পেনিসিলিয়ম নোটেটম থেকে পেনিসিলিন পাওয়া গেল, অন্য ছত্রক থেকে জীবাণুধ্বংসকারী পদার্থ পাওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হচ্ছে। আমাদের বাঙলাদেশে একটা চেষ্টা চলেছে। শ্রীসহায়রাম বসু আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে ছত্রক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে আসছিলেন। বিশেষভাবে পলিস্টিকটস্ স্যানগুইনস্ নামক ছত্রক তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি সন্ধান করতে থাকলেন পেনিসিলিনের ন্যায় দ্রব্য ওই ছত্রক থেকে পাওয়া যায় কি না। অনেক পরীক্ষার পর তিনি অনুরূপ পদার্থ পেলেন, তার নাম দিলেন পলিপরিন। আশা করা যাচ্ছে পলিপরিন টাইফয়েড রোগে বিশেষ ফল দেবে। বর্তমানে আমেরিকায় পলিপরিন নিয়ে গবেষণা চলছে।

পলিপরিন সম্বন্ধে এখনও অনেক পরীক্ষা চাই, আর সেজন্য ওকে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করতে হবে। আশা করা যায়

ভারত সরকার এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন, আর একদিন এই ওষুধ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন করবে।

মাটির মধ্যে আছে কয়েক প্রকার জীবাণু, তাদের নিয়ে উদ্ভিদবিদ্ প্রাণিবিদ্ উভয়েই টানাটানি করেন। অ্যাক্টিনো-মাইসেটিস্ এইরকম একপ্রকার জীবাণু, না প্রাণী না উদ্ভিদ্। এই জীবাণু থেকে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়, তা থেকে প্রস্তুত হয়েছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন। অনেক রোগে স্ট্রেপ্টোমাইসিন কাজ দিচ্ছে। যক্ষ্মার কোনো কোনো স্তরে, প্লেগ, বি-কোলাই রোগে স্ট্রেপ্টোমাইসিনে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

জয়-পরাজয়

টাটার লোহার কারখানা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। কি ব্যাপারই চলছে ভিতরে! রসায়নবিদের পরীক্ষাগার এক বিস্ময়ের বস্তু। সামান্য সামান্য উপাদান থেকে কত রকমের জিনিস তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কোন বিজ্ঞানীর এমন কোন যন্ত্র নেই যাতে চারটি ভাত, একটু দুধ বা একটা সন্দেশ দিলে তারা রক্তের খাদ্যে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত কারখানা এই মানবদেহ!

তিন শ বছর আগে হার্ভে যখন বললেন যে, মানুষের হৃদয়যন্ত্র একবার কোঁচকাচ্ছে আবার ফুলে উঠ্ছে, আর তার ফলে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচল হচ্ছে, তখন লোকে সে কথাটা কিভাবে নিয়েছিল তা এই ঘটনাটা থেকে বোঝা যাবে। একটা সভায় হার্ভে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, পরীক্ষায় রক্ত চলাচল দেখিয়ে দেবেন। হার্ভে সভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, সভার সভাপতি

আছেন, আর কেউ নেই। যে মুটে জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল হার্ভে তাকে থাকতে বললেন, যাতে সভাপতি ছাড়া অন্তত একজন শ্রোতা থাকে। তবে বেশি দিন গেল না, হার্ভের মত লোকে নিল। আর এই তিন শ বছরের মধ্যে বিজ্ঞান কতদূর এগিয়ে গেল!

একটার পর একটা দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে অনেক কথা মানুষ জানতে থাকল। অনেক ব্যাধির উৎপত্তির কারণ বেরল, তাদের নিবারণের উপায় স্থির হল। এ সব এক বিরাট কাহিনী।

দেহের মধ্যে কতকগুলি নলহীন গ্রন্থি আছে। এদের অনেকগুলি সম্বন্ধে সেদিন অবধি মানুষের ধারণা ছিল যে তারা একেবারে অকেজো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এদের থেকে হর্‌মোন বলে যে সূক্ষ্মবস্তুর ক্ষরণ হয় তা দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে এক আশ্চর্যজনক সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। এই হর্‌মোন যেন একটি রাসায়নিক চূর্ণ। যে গ্রন্থিতে তৈরি হয় তা থেকে অনেক দূরে গিয়ে কাজ করে। এসম্বন্ধে কিছু কিছু আমরা জেনেছি, কিন্তু অনেক কথা আমাদের জানতে বাকি। থাইরয়েড ক্ষরণ ব্যবহারে বেঁটে অদ্ভুত চেহারার হাবাগোবা শিশু একেবারে সহজ মানুষ ব'নে গিয়েছে। আর ১৯২৬ সালে রসায়নবিদ্ এই বস্তুকে তাঁর পরীক্ষাগারে তৈরি করলেন। তবে কি আমাদের মনের ভাব, আমাদের চরিত্রের বল, আমাদের পাপকাজ পুণ্যকাজ করবার প্রবৃত্তি কতকগুলি গ্রন্থির ক্ষরণের উপর নির্ভর করছে, আর সেগুলি কি রসায়নবিদ্

তাঁর পরীক্ষাগারে তৈরি করবেন ? অ্যাড্রিনালিন তো মানুষের ভয় দূর করে ! তবে কি একদিন খিট্‌খিটে বদমেজাজের লোককে কয়েকটা বড়ি খাইয়ে বা দু-একটা ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে আমুদে হাস্যরসিক করে তোলা যাবে ! কল্পনায় তো এসব অসম্ভব বলে মনে হয় না ।

ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে মানব জয়ী হল। কিন্তু তার এই জয়ের ইতিহাস ছোট। বিজ্ঞান মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে অনেক দূর যেতে হবে, নানা দিকে চলতে হবে। আজও ডাক্তারের কাজ হল রোগের চিকিৎসা করা। সময় শক্তি ও অর্থকে অন্যদিকে ব্যয় করতে হবে। রোগ হলে তবে তো সারানোর কথা উঠবে। রোগ হবে কেন ? পৃথিবীকে শত্রুশূন্য করতে হবে, সব রোগের কারণ জানতে হবে, রোগ হওয়া বন্ধ করতে হবে। বিজ্ঞান তা যখন পারবে, ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে তখনই হবে তার পূর্ণজয়। কিন্তু তখনও একটা বড় কথা থেকে যাবে। মানুষের যোঝবার শক্তি বাড়াতে হবে, আর সেজন্য তার পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে বিজ্ঞান পথ দেখিয়ে দেবে বটে, কিন্তু ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র।

একটা ভয়ের ব্যাপার দেখা দিয়েছে। এক-এক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিজ্ঞান যেই একরকম জীবাণু মারবার উপায় বের করছে, অমনি সেই শ্রেণীর আর একরকম জীবাণু দেখা দিচ্ছে, যারা আগে কোনদিন ছিল না, আর যাদের উপর ওই মারণাস্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে। এদের আবার বধ করতে বিজ্ঞানকে নতুন উপায়

খুঁজে বের করতে হচ্ছে, আর যেই তা বেরল অমনি তৃতীয় দলের আগমন, এইরকম চলেছে। মরিয়া না মরে, মানবের এ কি রকম বৈরী! প্রকৃতিতে কি এইরকম বরাবর চলতে থাকবে? কে জানে! কিন্তু তা যদি চলে তবে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে মানবের সংগ্রাম কোনদিন শেষ হবে না।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১॥০
পঞ্চম সংস্করণ ॥ নবম মুদ্রণ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ১॥০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১।০
দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲
নবপ্রকাশিত

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩।০
নবপ্রকাশিত

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ যন্ত্রস্থ